

বৈদ্যুতিক চুল্লি

শঙ্কর চ্যাটার্জি



বৈদ্যুতিক চুল্লি

শঙ্কর চ্যাটার্জি

বৈদ্যুতিক চুল্লি

শঙ্কর চ্যাটার্জী



বৈদ্যুতিক চুল্লি
Boidyutik Chulli

পরিমার্জিত সংস্করণ
নভেম্বর, ২০২০

গ্রন্থসত্ব
শঙ্কর চ্যাটার্জী

প্রচ্ছদ
কৃষ্ণেন্দু মন্ডল

বিন্যাস
দীপ্তজিৎ মিশ্র (৯৮৭৫৩২১০১৪)

মুদ্রক
প্রিন্ট লিটিক্যাল (মো: ৯০০৭৮৬৪৮৯০)

প্রকাশক
রোশনী বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়
'খোয়াই প্বালিশিং হাউস', বেহালা, কলকাতা - ৬০

উৎসর্গ

আমার ভাইয়ের মতো প্রিয় লেখক ও সাহিত্য সমালোচক

ঋজু গাঙ্গুলীকে

ভূমিকা

প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই খোয়াই পাবলিশিং হাউসকে আমার লেখা বইগুলো প্রকাশ করে পাঠক-পাঠিকাদের পড়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

আমার এই বইয়ের গল্পগুলো যদি আমার অনুরাগীদের মনোরঞ্জন করতে পারে, তাহলে খুব আনন্দিত হব। আশা রাখি আগামী দিনে আরও নতুন নতুন গল্প লিখে আপনাদের মন জয় করতে সমর্থ হব। পাশে থাকবেন। আপনাদের সহযোগিতা, ভালোবাসা, আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যেন আরও এগিয়ে যেতে পারি।

ধন্যবাদান্তে,
শঙ্কর চ্যাটার্জী

পরিমার্জিত সংস্করণের ভূমিকা

বৈদ্যুতিক চুল্লি বইটির পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। ভূত মানেই যে সবসময় ভয় বা আতঙ্ক নয়, সে কথাই এই সংকলনের গল্পগুলোতে বলা হয়েছে। নতুন করে বইটির প্রচ্ছদ করে দেওয়ার জন্য কৃষ্ণেন্দু মন্ডলকে অনেক ধন্যবাদ। আশা করি, বইটি সব বয়সের পাঠক-পাঠিকার ভালো লাগবে।

ধন্যবাদান্তে,
শঙ্কর চ্যাটার্জী

সূচীপত্র

মৃতদেহ

খোকন ড্রাইভিং লাইসেন্সটা আজ হাতে পেল। মুখে একটু খুশির আলো ফুটে উঠল। এবার যদি কিছু পয়সা রোজগার করা যায়। তবু তো তাদের মত গরিবের ঘরে দু'মুঠো ভাত জুটবে!

সংসারে সে-ই বড়। এরপর এক ভাই আর বোন। বিধবা মা লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ করে। খোকনের বয়স তেইশ বছর। তার ওপরেই বেশি চাপ। ওর মুখে এই খবর শুনে মায়ের মুখে হাসি ফোটে। যাক, যদি দু'পয়সা বেশি আসে, সংসারের স্বচ্ছলতা বাড়ে। কিন্তু খোকন যা ভেবেছিল, তা হল না — কেউ বলে, কাঁচা লাইসেন্স। কেউ বা বলে — হাত আগে পাকাও! গাড়ি না চালালে হাত পাকবে কী করে? এইসব কথা শুনতে শুনতে হতাশা ঘিরে ধরে ওকে। একজন ড্রাইভার বন্ধু পরামর্শ দেয় — 'এখানে তোকে কেউ কাজ দেবে না। বরং চেনাজানা গন্ডি ছাড়িয়ে চলে যা। হয়তো কাজ জুটে যেতে পারে।' কথাটা খোকনের মনে ধরল। ব্যান্ডেলে ওর বাড়ি ছাড়িয়ে ত্রিবেণীর দিকে একদিন সে গেল। 'গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়' লেখা কয়েকটা দোকানে ঢুঁ মারল। ওর লাইসেন্সের ডেট দেখে একই কথা শুনতে হল। ও বলার চেষ্টা করেছিল।

— 'গাড়ি অনেকদিন চালায়। লাইসেন্স হালে বার করেছে।' ওর শুকনো মুখ দেখে একজন বলল, 'তুমি গোলক মন্ডলের ওখানে গেলে কাজ পেলেও পেতে পার। কয়েকদিন আগেই ও বলছিল ওর ড্রাইভার অসুস্থ। লোক খুঁজছিল।' নতুন একটা আশার আলো দেখতে পেল খোকন। ঠিকানাটা জেনে নিয়ে দুপুর রৌদ্রে ওখানে চলল।

গোলক মন্ডল তার বাড়িতেই ছিল। মোটা, ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা। তার ওপর যেন লোমের জামা পরে আছে। হঠাৎ দেখলে শিম্পাঞ্জির কথা মনে হয়। খালি গায়ে, লুঙ্গি পরে বেরিয়ে আসে। খোকনের মুখে সব শুনে বলে, 'আমার গাড়ি বেশি স্পিডে ছোটানোর প্রয়োজন হয় না। লাইসেন্স থাকলেই হল।'

খোকন বুঝতে পারল না লোকটা কী বলতে চাইছে।

— 'বুঝতে পারলে না ? আমার একটা মড়া বইবার গাড়ি আছে।' হেঁড়ে গলায় বলে লোকটা, 'ড্রাইভারের অভাবে রাতের দিকে ভাড়া খাটতে পারে না। এদিকে লোকের মরার কামাই নেই।'

মোদ্দা কথা কাঁচে ঢাকা শব বহনকারী গাড়ি। একটা অস্বস্তি দেহে খেলে গেল খোকনের। কিন্তু নেই মামার থেকে কানা মামা ভালো। অগত্যা রাজি হয়ে যায়। খোকন তখনও জানতে পারেনি এই গাড়ি তার জীবনে বয়ে নিয়ে আসতে চলেছে এক মহা নিশার অন্ধকার!

খোকনের ডিউটি ঠিক হল রাত আটটা থেকে ভোর পাঁচটা। খোকন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হল। কারণ এই চাকরিটাও হাতছাড়া করতে চায় না। বরং এই ফাঁকে অন্য কোথাও চেষ্টা করবে। গোলক মন্ডল বলল, 'প্রথমে আমি তোমাকে মাসে পাঁচ হাজার দেব। কাজ দেখে মাইনে বাড়াব। এই তিনদিন এখানকার রাস্তাঘাট একটু চিনে নাও।'

কথাবার্তা পাকা করে বাড়ি ফিরল খোকন। বাড়িতে মড়ার গাড়ি চালানোর খবরটা চেপে গেল। নাহলে মা আগেই মানা করবে।

কাজ শুরু করল খোকন। প্রথম প্রথম একটু অস্বস্তি হত মৃত মানুষগুলোকে স্ট্রেচারে করে গাড়িতে তুলতে। অবশ্য মৃতের বাড়ির লোকরাও হাত লাগাত। তবে রাত বারোটার পর সাধারণত কোনো ডাক পড়ত না। ও গোলক মন্ডলের গ্যারাজে রাতটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিত। পাশেই শববাহী গাড়িটা নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

সতর্ক হয়েই ঘুমোত ও, কখন ফোন বেজে ওঠে! এই ভাবে মাস দুয়েক কাটিয়ে দিল খোকন। ওর কাজের প্রতি মনোযোগ দেখে মালিক আরও হাজার টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে। সকালের ড্রাইভার রতন। বয়স্ক লোক। এখানেই বাড়ি। ও ভোর পাঁচটায় চলে আসত। খোকন এখন রাস্তাঘাট মোটামুটি চিনে গেছে। বাড়িতে জানে খোকন এক ডাক্তারের গাড়ি চালায় ডাক্তারের নাইট ডিউটি থাকে। এখন সংসার খানিকটা সচ্ছল হয়েছে।

এদিকে গরমের রোদ ঝলসানো তাপ ক্রমশ কমে আসছে। জুন মাসের মাঝামাঝি হতে চলল। আর বোধহয় এক সপ্তাহের মধ্যেই বর্ষা দেখা দেবে।

সেদিন খোকন গ্যারাজের সামনে পায়চারি করছে। গ্যারাজটা মন্ডলের বাগানের শেষ প্রান্তে। বাগানে ফুলের থেকে বড় বড় গাছের ভিড়। আম, কাঁঠাল, জামরুল ইত্যাদি। গুমোট গরম আর এক বিন্দুও হাওয়া নেই। থম মেরে আছে প্রকৃতি! গ্যারাজের ভেতর গরমে বসা কখনোই সম্ভব নয়। এই সময়ে দূরের অন্ধকার আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক খোকনের চোখে পড়ল। যা গরম পড়েছে বৃষ্টি না হয়ে যায় না ! মোবাইলে সময় দেখল। এগারোটা। রাত্রির বয়স বেশি হয়নি।

হঠাৎ গ্যারাজের ভেতর থেকে কাঁচ ঢাকা মৃতদেহ রাখার বাক্সটার ছিটকিনির চাপা শব্দ ওর কানে এল। যেন কেউ ছিটকিনি খুলে বেরোবার চেষ্টা করছে ! বুকে একটা শিরশিরানি উপলব্ধি করল খোকন। তারপরেই মনকে বোঝাল এ অসম্ভব ব্যাপার। ও নিশ্চয়ই ভুল শুনেছে। মনকে শক্ত রাখার চেষ্টা করল। গ্যারেজের ভেতর দিকে তাকাল। চল্লিশ পাওয়ারের বাল্বের আলো অন্ধকারকে পুরোপুরি দূর করতে পারেনি। তবু নিঃসন্দেহ হবার জন্যে ও পায়ে পায়ে গ্যারাজের দিকে এগিয়ে এল। চোখে পড়ল ছিটকিনি আটকানো খালি কাঁচের বাক্স। তখনই ওর কানে ভেসে এল মেঘ ডাকার গুড়গুড় শব্দ। একটা ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শ ওর শরীরে লাগল। তার মানে বৃষ্টি আসছে। গোলক মন্ডলের বাগানটা অন্ধকারে ঢেকে আছে। গাছে বাতাসের ছোঁয়া। গরম ভাবটা কমতে শুরু করেছে। এই প্রথম একটা কথা খোকনের মনে আঘাত করল। বৃষ্টি নামলে এই গ্যারাজেই ওকে আশ্রয় নিতে হবে। কথাটা মনে হতেই একটা গা ছমছম অনুভূতি শরীরকে ঘিরে ধরল। কিন্তু কেন এই অনুভূতি? ও কি ভয় পাচ্ছে? ভয়ের কারণ কী? আসলে ছিটকিনি খোলার শব্দটা এখনও কানের ভেতর ওর রয়ে গেছে।

বাতাসে গাছের পাতাগুলো কেঁপে উঠল। বর্ষার প্রথম বৃষ্টির জল খোকনের মাথায় পড়ল। আকাশে বিদ্যুতের চমকে এক সেকেন্ডের জন্যে বাগানটা আলোকিত হয়ে গেল। পরক্ষণেই কোথাও বাজ পড়ল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ও গ্যারাজের দিকে এগোল। গাড়িটা ওর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। মৃতদেহ রাখার জায়গা পিছন দিকে। আলো মাঝামাঝি থাকার জন্যে পিছন দিকটায় আলো-আঁধারির পরিবেশ। বৃষ্টি বেশ জোরেই নামল। গাছের পাতায় রিমঝিম ধ্বনি। সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। খোকন গ্যারাজের সামনে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে পারছে না। এদিকে বৃষ্টির তেজ ক্রমশ বাড়ছে। ভয়কে সংযত রেখে আরও একটু ভেতরে ঢুকল। গাড়িতে ড্রাইভারের সিটে ঢুকতেও গা শিরশির করছে।

এই সময় ওর নাকে অগুরুর গন্ধ ভেসে এল। এই ক'দিনে মড়া বয়ে বয়ে গন্ধটা নাকে পরিচিত হয়ে গেছে। বিকেলে রতনদা নিশ্চয়ই কোনো খেপ খেটেছে। তারই গন্ধ এখনও ছাড়ছে। তবু সে গাড়ির কাঁচের বাক্সের দিকে তাকাতে পারল না। মন থেকে বিস্তর ব্যাখ্যা দিয়েও আতঙ্কটাকে চাপা দিতে পারছে না। বরং পরিবেশের সাথে সাথে সেটা বেড়েই চলেছে। বাইরে রীতিমতো দুর্যোগ শুরু হয়ে গেছে ! বৃষ্টির সঙ্গে ঘনঘন বাজ পড়ার শব্দ ওর কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। খোকনের চোখে মুখে বিপদের আশঙ্কা। কিন্তু বিপদটা কীসের সেটাই ভেবে পাচ্ছে না।

এবার ওর নাকে অগুরুর সঙ্গে ধূপের গন্ধ নতুন করে এসে লাগল। এবার যেন স্নায়ুগুলো বিদ্রোহ করে উঠল। বৃষ্টিটা না হলে এই মুহূর্তেই হয়ত ও গ্যারাজ ছেড়ে বাইরে চলে যেত। অনেক চেষ্টা করল নিজের মনকে বোঝাতে। অহেতুক সে ভয় পাচ্ছে। ভয় জিনিসটাই এমন। একবার যদি মাথায় ঢুকে যায় হাজার

চেষ্টাতেও বার করা যায় না! ও নিজের অজান্তে নাকটা দু'বার টানল। ধূপের গন্ধ আরও বেশি করে ওর শরীরে ঢুকল। আর সংযত থাকতে পারল না সে। উৎকণ্ঠা কমাবার জন্যে গন্ধের উৎস খুঁজতে লাগল। মৃতদেহ রাখার কাঁচের ঘরটা ওকে অনেকক্ষণ থেকেই আকর্ষণ করছিল। এখন ভয়ে ভয়ে ঐ আবছা অন্ধকার বাক্সের দিকে তাকাল। আর সঙ্গে সঙ্গেই এক লহমায় দেহের সমস্ত রক্ত যেন মুখে উঠে এল ! স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে এল। ভয়ার্ত চোখে সে দেখল কাঁচের বাক্সে একটা মৃতদেহ শোয়ানো আছে! বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইল। তার উত্তেজিত মস্তিষ্কে নানা কথার খেলা চলছে। এই জন্যে ছিটকিনি খোলার শব্দ সে পেয়েছিল! আর এই অগরু আর ধূপের গন্ধ তার মানে ঐ মৃতের শরীর থেকেই আসছে!

কিন্তু রতনদা মড়াশুদ্ধু গাড়ি এখানে কেন রেখে যাবে? তাহলে যাবার আগে কিছু বলবে না? মাথা যেন এই বিষয়টা মেনেই নিতে পারছে না। সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে! হঠাৎ তার চোখ দুটো আরো সতর্ক হয়ে উঠল। সে দেখতে পাচ্ছে... মৃতদেহটা ধীরে ধীরে নড়ছে! খোকনের মুখের রেখাগুলো ভেঙেচুরে যাচ্ছে ! ছুটে পালাবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে কিন্তু পা দুটো সম্পূর্ণ অবশ। কাঁচের পাল্লাটা খুলে গেল। নিষ্প্রাণ দেহটা হামাগুড়ি দিয়ে নিচে নামছে...

ওর মস্তিস্ক এবার বিপদ ঘন্টি বাজাল। আর এখানে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু বিদ্রোহ ঘোষণা করছে ওর পা দুটো। শরীরের বাকি অংশ কেমন যেন অবশ হয়ে আছে... এ কি তবে অত্যাধিক ভয় পাওয়ার কারণে?

সেই মৃতদেহ একটু কাছাকাছি আসতে খোকন মরদেহের মুখ দেখে অজ্ঞান হয়ে যাবার আগের মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। এ কে? কাকে দেখছে ও? এ কি সম্ভব ? না চোখের ভুল? সেই ঘাড়ে-গর্দানে লোকটা! যার গায়ের কালো লোমগুলো অনেকটা বনমানুষদের মতো... আচমকা খোকনের কানে ঝড় বৃষ্টি ভেদ করে কান্নার শব্দ ভেসে এল। মালিকের বাড়িতে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে! কিন্তু মালিক তো এখানে! চোখের সামনে থেকে গোলক মন্ডলের মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল।

খোকন ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখল মালিক হাঁ করে বিছানায় মরে পড়ে আছে।



জলের গভীরে

প্রথম পর্ব

গতবারে পুজোর আগেই মামাতো ভাই বিল্টু ফোন করল, ‘সারা জীবন তো শহরের পুজো দেখলে, এবারে আমাদের গ্রামের পুজোও একবার এসে দেখে যাও…’

আমি সেবার মামার মৃত্যুতে ওদের ঐ ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে গিয়েছিলাম। বিংশ শতাব্দীর ছোঁয়া একটুও লাগেনি! বর্ধমান স্টেশন থেকে বাসে কাটোয়ার দিকে প্রায় আধ ঘন্টা যেতে হয়, তারপর সেখান থেকে ভ্যানরিকশা — অবশেষে বাকি পথটুকু হন্টন। তবে হ্যাঁ, যারা গ্রাম ভালোবাসে তাদের জন্যে আদর্শ জায়গা। মামা চিরকাল ক্ষেতখামার চাষবাস নিয়েই কাটিয়েছে, বিল্টুও তাই। আমাদের মতো শহুরে মানুষদের দু’-একদিন ভালোই লাগবে — সবুজ ধান ক্ষেত, মরাই, গোয়াল ভরা গরু, বড় বড় মাছভর্তি পুকুর, তাজা হাঁস-মুরগির ডিম, বটের ছায়া, বাঁশবন, শেয়ালের ডাক, কাশ ফুলের বাহার, শিউলি ফুলের গন্ধ, জিভে জল আনা খেজুর রস আর গুড় — আরও কত কী! নেই শুধু আলো জ্বলা রাস্তা-ঘাট, সিনেমাহল, হোটেল-রেস্তোরাঁ, শপিং মল, এসি, ফ্রিজ, ফোনের টাওয়ার। জানি না এই পাঁচ বছরে কিছু পরিবর্তন হয়েছে কি না। ওর আবদার সন্তর্পণে পাশ কাটাবার চেষ্টা করলাম।

— ‘আমি চেষ্টা করব, তবে কথা দিতে পারছি না!’

— ‘জানি তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ,’ ও প্রান্ত থেকে ওর চিনচিনে গলা ভেসে আসে, ‘আরে! দু’দিনের জন্যে এলে এমন কিছু গাঁইয়া হয়ে যাবে না।’

ও আমার সেন্টিমেন্টে আঘাত করতে চাইছে যাতে আমি রাজী হই। এখানকার পুজো ছেড়ে, আমোদ-আহ্লাদ ত্যাগ করে ঐ জনমানবহীন জায়গায়, রাতে লো ভোলটেজের আলো, নেট নেই, ধুর, পোষাবে না।

— ‘কিছু মনে করিস না, পরে একদিন যাব। তাছাড়া ছেলে পুজোর ক’দিনই আসে মুম্বাই থেকে।’

অভিমানী গলায় বলল বিল্টু, ‘খুব আশা করেছিলাম, পুজোর ক’টা দিন গল্প করে কাটাব।’ আসলে ও আর আমি তিন-চার বছরের ছোট-বড়… ছোটবেলা থেকে কেন জানি না ও আমার খুব অনুগত ছিল! ওরা গ্রামাঞ্চলে থাকে বলেই হয়ত আন্তরিকতাটা এখনও হারিয়ে যায়নি!

— ‘রাগ করিস না, শীতের দিকে তোর বৌদিকে নিয়ে যাব।’

— ‘তুমি আর এসেছ! সেই বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে এই পাঁচ বছরে সময় হল না!’

মোক্ষম বলেছে, কী উত্তর দেব? কথা ঘোরাবার চেষ্টা করলাম।

— ‘বাবা..তোদের এখন ওখানে অনেক উন্নতি হয়েছে। এতক্ষণ কথা বলছিস… টাওয়ার আছে তাহলে!’

— ‘সে গুড়ে বালি, আমি বর্ধমান এসেছি… জমির সার কিনতে।’

— ‘তাই বল, তোরাই বরং একবার ঘুরে যা!’

— ‘তুমি তো জানোই আমি একদিন গেলেই এখানে অন্ধকার… আচ্ছা, তোমার ভূতের গল্প লেখার নেশাটা এখনও আছে?’

এবার একটু খটকা লাগল। হঠাৎ এ কথা কেন?

— ‘তা এখনও একটু-আধটু লিখি…’

— ‘সে জন্যেই আসতে বলছিলাম… এখানে এলে গল্প লেখার খোরাকটা পেতে…’

আমার কান সজাগ হল।

— ‘কেন? ওখানে আবার কী খোরাক আছে?’

— ‘একটা জিনিস তোমায় দেখাব আর শোনাব, যাতে করে তুমি একটা ভালো স্টোরি পেয়ে যাবে…’

— ‘কী দেখাবি আর শোনাবি, কোনো বস্তাপচা পুরনো ভূতের গল্প...আর তার সাথে মিলিয়ে কিছু নিদর্শন... তাই তো? তুই ঐ বলে আমাকে ভোলাচ্ছিস?’

— ‘মা কালীর দিব্যি, বিশ্বাস করো! তুমি পুজোর মধ্যে দু’দিনের জন্যে এসো! তোমাকে একটা অভিশপ্ত পুকুর আর এক বিদেহী আত্মা দেখাতে চাইছি। কয়েকজন ছাড়া ব্যাপারটা কেউ জানে না। জানলেও ভয়ে কানাকানি করে না! আমি সবে মাত্র জেনে ফোন করেছি’

আমার পুরনো রোগ মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে। উত্তেজনার সঙ্গে কৌতূহল মিশছে। ঠাকুরের দিব্যি খেয়ে বিল্টু আমাকে অন্তত ভড়কি দেবে না! তবে কি সত্যিই কিছু আছে? গোবিন্দপুর হাতছানি দিচ্ছে।

— ‘একটু খোলসা করে বল। অতটা পথ গিয়ে যদি দেখি ভাঁওতা...’

ও মনে হয় আমার কথায় ক্ষুণ্ণ হল, ‘তুমি ছোটবেলায় পানিমুড়ার নাম শুনেছ তো?’

মনে পড়ে গেল, এক ধরণের জলভূত — পুকুরের পাড়ে থাকত...কিন্তু সে তো গল্প!

— ‘দ্যাখ ভাই ঝেড়ে কাশ, ব্যাপারটা কীরকম ধোঁয়াটে লাগছে।’

বোধহয় অনেকক্ষণ কথা বলা হয়ে গেছে দেখে ও শেষ টানতে চাইল। সত্যিই তো বিল উঠছে ওর!

— ‘তোমাকে একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারি, নিরাশ হবে না! কেননা আমিও কিছুটা সাক্ষী আছি এবং ইতিমধ্যে একটা অঘটন ঘটে গেছে... জানি না এরপর কী ঘটবে। রাজি থাকলে জানিও, বর্ধমান স্টেশনে তোমার জন্যে ওয়েট করব।‘ বলে লাইন ছেড়ে দিল।

ব্যাপারটা বেশ ভাবনায় ফেলে দিল। এতদিন বাদে এরকম একটা সংবাদ... আধুনিক সভ্যতায় যা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে! ওর কথাগুলো মনে মনে সাজালাম, পুকুর, পানিমুড়া, বিদেহী আত্মা, অঘটন, সাক্ষী!

পুজো আসতে এখনও দিন বারো বাকি। এর মধ্যে আরও কিছু তথ্য জানা দরকারই। গ্রামের মানুষরা এমনিতেই তিলকে তাল করে! স্ত্রীকে বলে রাখলাম। ও অবাক হয়ে গেল। বললাম, ‘ও একেবারে নাছোড়বান্দা, জানোই তো!’ আসল কথাটা উহ্য রাখলাম।

ছেলে এতদিন বাদে আসছে বলে স্ত্রী একটু তানানানা করছিল। বললাম, ‘দু’দিনের তো ব্যাপার।’

দিন তিনেকের চেষ্টায় বিল্টুর লাইন পেলাম, যেটুকু কেটে কেটে কথা হল তার সারমর্ম হচ্ছে — ওদের গোবিন্দপুর থেকে কিছুটা দূরে দীঘির ধার বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে পালবাড়ির বড় বউ এক বছর আগে ওদের বাড়ীর সামনের পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করে পারিবারিক কারণে। তারপর থেকেই পুকুরে শুরু হয় নানান উৎপাত! হঠাৎ হঠাৎ মাছ মরে ভেসে ওঠে, জলের মাঝে বড় বড় বুড়বুড়ি কাটে! ধারে কাছে যা দু’-একটা বাড়ি আছে, সেখানে বেশির ভাগ সময় অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। সন্ধ্যেবেলা পালবাড়ির কেউ কেউ বড় বৌকে পুকুরের কালো জলে ভেসে থাকতে দেখেছে! আবার কখনও পুকুরঘাটে বসে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদে! একদিন ঘাটের পাশে গাবগাছে পা ঝুলিয়ে বসেছিল — আর একটা কী বলতে গিয়েই বিল্টু ঢোঁক গিলে ফেলল। এতে রহস্য আরও ঘনীভূত হল যেন! এরপরে অপেক্ষা বা না যাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই! পাকা কথা দিয়ে দিলাম... অষ্টমীর দিন সকালে যাচ্ছি। ও বর্ধমান স্টেশনে অপেক্ষা করবে জানাল।

অষ্টমীর দিন বেলা বারোটার মধ্যে বিল্টুর সঙ্গে ওর বাড়ি পৌছলাম। ওর বউ রিনা আর মেয়ে হাসিমুখে আপ্যায়িত করল। রিনার জন্যে শাড়ি, আলতা, সিঁদুর, মিষ্টি আমার গিন্নী পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমি ওর মেয়ের হাতে হাজার টাকা দিলাম। খুব খুশী হল ওরা! সাদাসিধে জীবন, আর মনগুলোও পরিষ্কার, অল্পতে খুশী হয়। অবশ্য কিছু জায়গায় শহুরে বিষ ঢুকতে শুরু করেছে। ওরা অনেক রান্নাবান্নাও করেছিল। বিকালে ঠাকুরতলায় গ্রামের একমাত্র দূর্গাপ্রতিমা দেখাতে নিয়ে চলল বিল্টু। পথে বেরিয়ে এই প্রথম আসল বিষয় নিয়ে কথা বলার সুযোগ পেলাম। কেননা ও পই পই করে বলে দিয়েছিল বাড়িতে মুখ না খোলার জন্যে।

স্টেশন থেকে আসার সময়ও বাসে ভীড়ের জন্যে বেশি কথাও বলা যায় নি। ঠাকুর প্রণাম করে, একটা চায়ের দোকান থেকে দু'ভাঁড় চা নিয়ে পাশেই ফাঁকা একটা জায়গায় দাঁড়ালাম।

চায়ে চুমুক দিয়ে বিল্টু বলল, 'তুমি এখনও সাইকেল চালাও তো?' ভুরু কুঁচকে ঘাড় নাড়লাম।

— 'কাল বিকেলে দুটো সাইকেল নিয়ে... বন্ধুর বাড়ির নাম করে বেরোব।'

— 'এখান থেকে কত দূর? এখানকার যা রাস্তার অবস্থা...তার ওপর সাইকেল!' আমার হাতে চায়ের ভাঁড়।

— 'একটু চেনা-টেনা বাঁচিয়ে যেতে হবে, না হলেই প্রশ্নের ঝড় —' ও খালি ভাঁড়টা পাশে ফেলে দিয়ে বলল, 'গ্রামের এই ব্যাপারগুলো এখনও যায়নি — কোথায় যাচ্ছ? কেন যাচ্ছ? কী দরকার? নাজেহাল করে দেবে, আর পরক্ষণেই বাড়িতে খবর চলে যাবে..' ও একবার এদিক ওদিক তাকাল।

— 'কতক্ষণ লাগবে সাইকেল করে যেতে?' চা শেষ করে একটা সিগারেট ধরালাম।

— 'মিনিট কুড়ি লাগবে, সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে যাব।' গলার স্বর একটু নামিয়ে বলল বিল্টু।

— 'তুই এর আগে গিয়েছিলি? বা কিছু দেখেছিস?'

— 'পুকুরপাড়ে সকালে গেছি — রাত্রে? অত সাহস বুকে নেই! শুধু তোমার জন্যেই যাওয়া —' ওর চোখে মুখে একটা রহস্য খেলা করছে!

— 'জানি, ছোটবেলা থেকেই আমার ভক্ত ছিলি...' সিগারেটে টান মেরে ধোঁয়া ছাড়লাম, 'আচ্ছা, তুই সেদিন ফোনে কী একটা বলতে গিয়ে ঢোঁক গিললি বল তো?'

আবার একবার এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে গলাটা আরও খাদে নামিয়ে বিল্টু বলল, 'চার মাস আগে পালবাড়ির মেজ বৌটাকেও টেনে নিয়ে গিয়ে বড় বৌটা পুকুরের পাশে নরম কাদার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে মেরেছে!'

সিগারেটের ছাই ঝাড়লাম। মনের মধ্যে কথার কাটাকুটি চলছে — 'কোনো মানুষের কাজ নয় তো? ভূতের গল্প ফেঁদে খুন করছে?'

— 'তাহলে তোমাকে ডাকতাম না... পুলিশরাই ব্যবস্থা নিত।' ওর গলাটা একটু চড়ল।

— 'এত শিওর হচ্ছিস কী করে?' শেষ টান দিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিলাম। ও একটু চুপ করে রইল, 'পালবাড়ির মেজ ছেলে নির্মল, যার বউ মরেছে... সে আমার বন্ধু।'

এবার সোজাসুজি আমার মুখের দিকে তাকাল, 'গত পাঁচমাস ধরে প্রতিটি কথা ও আমায় বলেছে...'

আমার জানার ইচ্ছে ক্রমশ বাড়ছে। এ তো দেখছি ছাইচাপা আগুন!

— 'দ্যাখ, তুই যদি অর্ধেক কথা পেটে, আর অর্ধেক কথা মুখে বলিস... তাহলে তো পুরো ঘটনাটা আমি পাঠক-পাঠিকাদের লিখে জানাতে পারব না! গল্পটাই জোলো হয়ে যাবে।'

— 'বলব... সব কথাই জানাব। তোমার মতো লেখক তো নই...সব সাজিয়ে কি আর বলতে পারব?' ওর ভুলটা ও বোধহয় বুঝতে পারল। ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, 'সাতটা বাজতে চলল... চলো বাড়ি ফিরি, আমরা গেলে ওরা ঠাকুর তলায় আসবে সন্ধিপুজো দেখতে। তখন ফাঁকা বাড়িতে বাকিটা শোনাব।'

— 'ভেরি নাইস, চল।' উত্তেজনা আমার কণ্ঠে।

ওরা পুজো দেখতে যাওয়ার আগে আমাদের জন্যে মুড়ি, বেগুনি, নারকেল নাড়ু আর চা দিয়ে গেল। আহা... কতদিন পর নাড়ু খাচ্ছি! খেতে খেতে বিল্টু শুরু করল তার না বলা কথা আর আমি একাগ্র শ্রোতা।

'বড় বউ আর মেজ বৌয়ের মধ্যে বনিবনা কোনোদিনই ছিল না। যৌথ পরিবারে যা হয়ে থাকে। কিন্তু বিপরীত হচ্ছে দু' ভাই — বউদের অশান্তি, খিটিমিটি দেখেও আমল দেয় না। ভাইয়ে-ভাইয়ে গলায় গলায়! এই দেখে দুই বউই জ্বলেপুড়ে মরে... আলাদা করে স্বামীদের বুঝিয়ে লাভ হয় না... একদিন চরম বিস্ফোরণ ঘটল! তুমুল চেঁচামেচির মধ্যে সবাইয়ের সামনে বড় ভাই মুখ খুলল। বড় বউকে যাচ্ছেতাইভাবে ধমকাল।

ব্যস... যেন আগুনে জল পড়ল। পুরো বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে গেল! বড় বউ সেই যে চুপ করল, মরার আগে পর্যন্ত কথা বলেনি।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা গা ধুতে গিয়ে পুকুর থেকে আর উঠল না! কয়েক ঘন্টা বাদে দেহ ভেসে উঠল। পুলিশ এল, মরা দেহ কাটা-ছেঁড়া হল। আত্মহত্যার কেস হল। গত বছর থেকেই পালবাড়ি চুপচাপ হয়ে গেল...মরার কিছুদিন পর থেকেই... অন্যান্যরা কিছু না দেখলেও, বাড়ির লোকেরা বড় বউকে পুকুরের আশেপাশে দেখতে পেত! বাড়ির মধ্যেই কথাটা সীমাবদ্ধ ছিল, পাছে বাড়ি আর পুকুরের বদনাম হয়ে যায়। বাড়ির সবাই সযত্নে পুকুর ব্যবহার করা ত্যাগ করল।'

একটানা কথা বলে বিল্টু জল খাওয়ার জন্য থামল। ফ্লাস্ক থেকে দুজনে চা ঢাললাম।

'মাস ছয়েক আগে হঠাৎ করে মেজ বৌয়ের ফিটের রোগ ধরা পড়ল! একদিন দোতলা থেকে সন্ধ্যেবেলা সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে হাত-পা শক্ত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল! ভাগ্য ভালো, সেই সময়ে বড়বাবুর ছেলে ওপরে উঠছিল। কোনোরকমে ধরে ফেলে — না হলে সেদিনই সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ে মারা যেত! এরপর থেকেই দু'-একদিন বাদে বাদেই ফিট হতে শুরু হল। ডাক্তার-বদ্যি কিছুই বাদ গেল না, কোনো উপশম হল না... বরং বেড়েই চলল। আর একটা নতুন উপসর্গ লক্ষ্য করা গেল — ইঁদারা বা টিউবওয়েলের জলে চান করতে বা গা ধুতে চাইত না, খালি পুকুরে যেতে চাইত! বাড়ির লোক সতর্ক থাকত। খিড়কির দরজায় চাবি দেওয়া হল। বাড়ির কুলগুরুকে ডেকে পুজোআচ্চাও করানো হল — কিন্তু কোনো লাভ হল না। ওরা নিশ্চিত হল... বড় বৌয়ের আত্মা ভর করেছে প্রতিশোধ নিতে। গয়া গিয়ে পিন্ড দিয়ে আসা হল... নির্মল আমার সঙ্গে দেখা হলেই দুঃখের কথা জানাত! কিন্তু কী সান্ত্বনা দেব মাথায় আসত না' — আমাদের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। দূর থেকে ভেসে আসছে ঢাকের আওয়াজ। মনে হয় সন্ধিপূজা শুরু হয়ে গেছে।

এবার গল্পটা একটা রূপ পাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম — 'তারপর?' ও আবার শুরু করল:

'বড় ভাইয়ের ছেলে পাটনায় চাকরি পেয়ে চলে যাবে, তাই বাড়ির সবাই তাকে বর্ধমান স্টেশনে ট্রেনে তুলতে যাবে। মেজ বউকে দেখার জন্যে বড়বাবু আর নির্মলের মেয়েকে সবাই বাড়িতে রেখে গেল। তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মেজ বউ খিড়কি দরজার চাবি খুলে কোনো এক সময়ে ঐ রাক্ষুসে পুকুরে চলে গেল! মাকে ঘরে না দেখেই হাঁপাতে হাঁপাতে ওরা ছুটল পুকুরঘাটে। ভয়ার্ত চোখে দেখল ঘাটের পাশে নরম কাদামাটিতে মুখ গুঁজড়ে মায়ের মরা দেহটা পড়ে আছে! এবার পুলিশের হয়রানি বেশী হল। নির্মল একদম ভেঙে পড়ল। চারপাশে কানাকানি শুরু হল। সকলেই পালবাড়ি আর পুকুরকে এড়িয়ে চলতে শুরু করল। সকলেরই মনে ভয় দানা বেঁধেছে।' ও থামল। ওর চোখেও ভীতু চাউনি। হাতের আঙ্গুল মটকালাম, 'তোর বন্ধু জানে, আমার কথা?'

— 'হ্যাঁ। ওর বাড়ীতে সাইকেল রেখে তারপর পুকুরপাড়ে যাব। যদি বরাতে থাকে... দেখা পাবে!'

মনমরা অবস্থায় মাথা দোলালাম, 'না রে বিল্টু, এ যাত্রা আর বোধহয় হল না... মেজ বৌয়ের ওপর যদি প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তো আর এ তল্লাটে ওর থাকার কথাই নয়!'

আমার শুকনো মুখটার দিকে তাকিয়ে বিল্টু ভাঙা গলায় বলল, 'পনের দিন আগে নির্মল ওর বৌদিকে দেখল বলেই তো তোমায় ফোন করে আসতে বললাম।'

আমার চোখে মুখে হারানো উত্তেজনা আবার ফিরে এল।

'কোথায় এবং কী দেখল?' আমার উৎসাহের গলা। কিন্তু ও মুখ খোলার আগেই রিনা আর তার মেয়ে ফিরল। আমরাও ঐ প্রসঙ্গ বন্ধ করলাম। আর একটু বাদে এলে কী ক্ষতিটা হত? আবার অপেক্ষা।

দ্বিতীয় পর্ব

রাতে আমি আর বিল্টু একসঙ্গে শুলাম। আমার মনে নির্মলের দেখা পাওয়ার ব্যাপারটা শোনার আগ্রহ এই কয়েক ঘন্টায় তুঙ্গে উঠেছে। মন বলছে যদি এখনও সে থেকে থাকে তাহলে বড় বিপদ! কেননা ও যতদূর সম্ভব পিশাচিনীতে পরিণত হয়ে গেছে। পীরবাবার কথা মনে পড়ছে। এই সময়ে এখানে থাকলে ভয়টা কাটত। ততক্ষণে রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে। আর চুপ থাকতে না পেরে বলে উঠলাম, 'এবার শুরু করে দে, না হলে আবার কখন বাধা পড়বে!' খাটে পা ছড়িয়ে বসে বিল্টু শুরু করল তার অসমাপ্ত কাহিনী —

'নির্মল সন্ধ্যেবেলায় ঘরে বসে বই পড়ছিল। মনটা ওর একদম ভেঙে গেছে। কয়েকদিন বাদে পুজো। মা-মরা মেয়েটার কথাও ভাবছিল বই মুখে করে। হঠাৎ পুকুরের ধার থেকে ঝপাং করে কিছু একটা জলে পড়ার শব্দ ভেসে এল। ভয়ে মুখ শুকিয়ে উঠল ওর। আবার কি কেউ জলে ঝাঁপ দিল? একরকম ছুটে নিচে নেমে এসে পুকুরের ধারে চলল। সূর্য অস্ত গেলেও এখনও পুরো আঁধারে চারিদিক ছেয়ে যায়নি। পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখল সিঁড়ির শেষ ধাপের কাছাকাছি জলটা কেমন অস্বাভাবিক ভাবে ঘোলাচ্ছে। তাহলে বড় কোনো মাছ ঘাই মেরেছে। কিন্তু তার ভাবনাকে ভুল প্রমাণ করে বড় বৌদির মুন্ডুটা জলে ভেসে উঠল! ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বীভৎস হাসি হাসল। আতঙ্কে ওর থরথর করে কাঁপুনি শুরু হল। কয়েক মিনিটের মধ্যে মুন্ডু সমেত বুক পর্যন্ত, কদর্য দেহটা জলের ওপর দেখা দিয়ে ডুবে গেল। কালো জলের ওপর শুধু বুড়বুড়িগুলো ভেসে রইল। এর মাঝে বাবাকে ঘরে খুঁজে না পেয়ে পুকুরঘাটে চলে এসেছে মেয়ে। ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া বাবাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও কোনোরকমে ধরে ধরে বাড়ির ভেতর নিয়ে এল।' একটানা বলে বিল্টু থামল।

তাহলে কি আবার কাউকে পিশাচিনী টানছে? মাথার ভেতর এই প্রশ্নটাই আমার এল। এরপর আর কথা না বাড়িয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম।

পরদিন বিকেল বেলায় পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বিল্টুর সঙ্গে সাইকেল নিয়ে বেরোলাম পালবাড়ির উদ্দেশ্যে। প্রকৃতির আলো থাকতে থাকতে যেতে চাইছি যাতে কমপক্ষে পুকুরটার একটা ছবি তুলতে পারি। সঙ্গে নিত্যসঙ্গী টর্চ আছে। ওদের পাড়া ছাড়িয়ে আঁকাবাঁকা মেঠো পথ দিয়ে বিল্টুর পিছু পিছু চলেছি। মাঝে মাঝে কাশ ফুলের জঙ্গল। দূষণমুক্ত বাতাস, নীল আকাশে সাদা স্তূপাকার মেঘ! দূর থেকে ভেসে আসা ঢাকের আওয়াজ। সব মিলেমিশে বেশ ভালো লাগছে। বিল্টু বোধহয় কোনো শর্টকার্ট রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলেছে। কেননা বেশি লোকের আনাগোনা নেই। কুড়ি মিনিট সাইকেল চালাবার পর একটা সাদা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। খুব সম্ভবত এটাই পাল বাড়ি। আমার চোখ তখন অভিশপ্ত পুকুরটাকে খুঁজছে। ও বুঝতে পেরে বলল, 'তুমি যাকে খুঁজছ সেই মানুষখেকো পুকুরটা বাড়ির পিছন দিকে।'

আমাদের সাড়া পেয়ে বিল্টুর বয়সীই একজন লোক বেরিয়ে এল। মুখে শোকের চিহ্নের সাথে দু' চোখে এক দূরাগত ভয়ের ছায়া। ম্লান মুখে আমাদের আপ্যায়িত করল। বিল্টু বলল, 'আমার দাদা, যার কথা বলেছিলাম। পুকুরটা একটু দেখতে চাইছে। নির্মল ঘাড় নেড়ে সায় জানাল কিন্তু আমাদের সঙ্গে এল না। বিল্টু দেখলাম চেনে। বাগানের মাঝখান দিয়ে ইঁটের সরু রাস্তা বাড়ির পিছন দিকে চলে গেছে। আমরা ঐ পথ ধরে বন্ধ খিড়কি দরজার কাছে এলাম। দরজা খুলে পাঁচ-সাত পা এগোলেই পুকুরটা। বেশ বড় লম্বাটে ধরণের। ওদিকের প্রান্তে তিন-চারটে টিনের চাল দেওয়া ছোট ছোট বাড়ি চোখে পড়ছে। পুকুরের আশেপাশে বড় বড় গাছ রয়েছে। বেশির ভাগই ফলের গাছ — আম, কাঁঠাল, জাম। এছাড়া গাবগাছ ও তেঁতুলগাছও চোখে পড়ছে। এত গাছের আধিক্যের জন্য জলের রং কালচে লাগছে। জলের ওপর সবুজ শ্যাওলার চাক ভাসছে। ঘাটের কাছে এসে দাঁড়ালাম। কালো জল একেবারে স্থির। আশ্বিন মাসের বাতাস হীন সন্ধ্যা নামছে। এক-আধটা ঝিঁঝির ডাক কানে এল। তরঙ্গহীন জলের গভীরে কি খেলা চলছে কে জানে! গাছের দরুণ রোদের আলো আটকে যাওয়ার জন্য চারিদিকে কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব।

বিল্টু আঙুল তুলে যেখানে নির্মলের বউয়ের দেহটা পড়েছিল, সেই জায়গাটা দেখাল। পুকুরের পাড়ের কাছে লম্বা লম্বা ঘাসের মাঝে কাদা মাখামাখি একটু জায়গা। বধ্যভূমি! কথাটা আচমকা মনে আসতে শরীরে

অদ্ভুত শিহরণ খেলে গেল। চশমাটা ঠিক করে নিলাম। ঘাসে ভরা স্থানটা আশ্চর্যজনক ভাবে আকর্ষণ করছে! জোর করে চোখটা সরিয়ে নিলাম। মনে হচ্ছে কিছু একটা আছে! বিল্টুকে বললাম, 'এই ঘাটে বসে খানিকটা সময় কাটিয়ে দেব।'

'সে হবে 'খন, এখন চলো। নির্মল চায়ের ব্যবস্থা করেছে,' ওর কথায় কেমন যেন পালাই পালাই রব। এই সময় কাছের ঝাঁকড়া গাব গাছটার মোটা ডালগুলো আচমকা দুলে উঠল। মনে হল গাছের ডালে দাঁড়িয়ে কোনো শক্তিশালী লোক ডালটা পা দিয়ে দোলাল। কিছু শুকনো পাতা ঝরে পুকুর জলে পড়তে লাগল।

'হনুমানের দল হবে বোধহয়।' আমি বললাম।

বিল্টুর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ও আমার হাত ধরে বাড়ির দিকে টানতে শুরু করেছে। এখনই যদি ও এত ভয় পেয়ে যায় রাত পর্যন্ত আমার সঙ্গে এই ঘাটে বসে থাকবে কী করে? অগত্যা পালবাড়িতে ঢুকলাম।

নির্মল আর ওর দাদা চা খেতে খেতে বারবার নিষেধ করল — সন্ধ্যের পর ওখানে না যাওয়াই মঙ্গল। কেননা নির্মল সেদিন ওর বৌদিকে দেখার পর থেকে মেজ বৌমার মতো খালি পুকুরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছে! আমি আর ওর মেয়ে বাধা দিচ্ছি।

নির্মল আধখানা বিস্কুট মুখে পুরে বলল, 'দাদার কথা ঠিক। কিরকম একটা অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করছি। বিশেষ করে সন্ধ্যের পর থেকে মনকে শক্ত রাখার হাজার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছি। যেমন নেশাগ্রস্তকে নেশার জিনিস টানে, তেমনই।' ওর চোখের তারাগুলো থিরথির করে কাঁপছে। এই প্রথম আমার মস্তিষ্কে একটা বিপদ ঘন্টি বাজল। ও নিশ্চয়ই আত্মার আকর্ষণে পড়ে গেছে।

'আমার মন বলছে, আবার কিছু অশুভ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। আপনাদের উচিত, এই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া —'

দুই ভাই সহমত হল। বিল্টু আমাদের কথা চোখ গোলগোল করে শুনছে। ওঠার নাম নেই। জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সন্ধ্যের আঁধার গুটি গুটি করে নেমে আসছে।

বলে উঠলাম, 'এবার পুকুরের দিকে যাওয়া যাক! যার জন্যে এতদূর আসা।' দেখলাম সবাইয়ের মুখেই আতঙ্কের ছাপ।

নির্মল হঠাৎ বলে উঠল, 'কেউ না যাক, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।'

বলেই ও তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ল। চমকে উঠলাম আমি। সভয়ে দেখলাম, নির্মলের মুখে প্রতিজ্ঞার চিহ্ন। শুধু যাওয়ার অপেক্ষা। সতর্ক হলাম। আমার কৌতূহল চরিতার্থ করার চেয়ে নির্মলকে বিপদের হাত থেকে বাঁচানো আগে প্রয়োজন। ওর মা-মরা মেয়ের মুখ চেয়ে কঠিন গলায় বললাম, 'পুকুরঘাটে কেউ যাবে না! এমনকি আমিও না।'

আমার কথা শুনে ও মুখটাকে রাগের মুখোশ বানিয়ে ফেলল। আমাদের দিকে রাগের দৃষ্টিতে তাকাল। এক মুহূর্তে মানুষের শরীরে এত পরিবর্তন ঘটতে পারে, ধারণা ছিল না। ওর হাত-পায়ের পেশীগুলো রীতিমতো শক্ত হয়ে উঠেছে। চোয়ালে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ও পা বাড়াল যাবার জন্য।

অন্তিম পর্ব

আমরা নির্মলকে জাপটে ধরলাম। কিন্তু ওকে ধরে রাখতে পারছি না। ওর গায়ে যেন দশটা দানবের শক্তি ভর করেছে! কোথা থেকে এল এত ক্ষমতা? আমাদের তিনজনকে যেন মেঝেতে ফেলে দেবে। মিনিট কয়েক টানা-হ্যাঁচড়ার পর ও নিস্তেজ হয়ে পড়ল। আমরা তখন রীতিমতো হাঁফাচ্ছি। শরীর ঘামে ভিজে গেছে। বাইরে তখন সন্ধ্যের অন্ধকার ঘন হচ্ছে। আমার ভূত দেখার ইচ্ছে কমে গেছে। আমাদের চেঁচামেচিতে নির্মলের মেয়ে মুখে একরাশ ভয় নিয়ে ঘরে ঢুকল।

'বাপি তুমি ওরকম আবার করছ? মা চলে গেছে, এবার তুমিও কি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?' কান্নায় ওর গলা বুজে আসছে। খুব কষ্ট লাগল।

এই সময় খিড়কি দরজা ধাক্কাবার শব্দ কানে এল। কেউ বা কারা সজোরে বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে চলেছে! ওদের ওখানে রেখে আমি আর বিল্টু টর্চ হাতে বাইরে এলাম। ইশারায় নির্মলের দাদাকে বললাম ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিতে যাতে ওর ভাই পালিয়ে যেতে না পারে। এদিকে খিড়কি দরজার আঘাত ক্রমশ বাড়ছে। এভাবে চললে কিছুক্ষণের মধ্যে কাঠের দরজা ভেঙে পড়তে পারে।

খিড়কি দরজার দিকে কোনো আলো নেই। টর্চের আলোয় আমরা দুজন দরজার কাছাকাছি এসে পড়েছি। এখনও সমানে দরজার পাল্লা দুটো বারবার ধাক্কার চোটে কেঁপে উঠছে! মনে হচ্ছে, বাইরে অন্তত জনা ছয়েক লোক একসঙ্গে দরজার ওপর লাথি, ঘুঁষি মারছে!

বিল্টু ভয়ার্ত গলায় বলল। 'শঙ্করদা, খবরদার দরজা খুলো না। বুঝতে পারছ না কেন? ওগুলো মানুষ নয়। খুললে, আমরাও মারা পড়ব।"

ওর কথাগুলো আমার কান দিয়ে ঢুকে মনে আঘাত করল। কিন্তু এত সামনে এসে, অতীন্দ্রিয় শক্তিকে চাক্ষুষ দেখতে পাব না? এতদিন বইয়ে, সিনেমায়, তান্ত্রিকদের কাছে যা শুনে এসেছি! তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হব?

এবার দরজায় একটা মড়মড় শব্দ হল। তার সাথে পাল্লাতে চিড় ধরল। তান্ত্রিকের কথাটা মাথায় আসতেই মৃত পীরবাবার মুখটা মনের আয়নায় ভেসে উঠল। ওঁর মাজারে যেতাম নানাবিধ অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখার নেশায়। যা পরবর্তী সময়ে গল্পের আকারে লিপিবদ্ধ করেছি।

সেই সময় পীরবাবা বলেছিলেন এইসব অশুভ শক্তির মুখোমুখি হওয়ার জন্যে নিজেকেও তান্ত্রিক বিদ্যায় পারদর্শী হতে হয়। দেহে মনে শক্তি সঞ্চয় করতে হয়। নাহলে পিশাচ শক্তির হাতে মৃত্যু অবধারিত। কথাটা মনে পড়তেই নিজেকে সংযত করলাম। তবু কৌতূহল দমন করতে না পেরে চিড় ধরা কাঠের ফাটলে টর্চের আলো ফেললাম।

আতঙ্কিত চোখে দেখলাম ফাটল দিয়ে এক দলা পুকুরের দুর্গন্ধ যুক্ত শ্যাওলা ঢুকে আসছে! সেই শ্যাওলার মধ্যে বিজবিজ করছে অসংখ্য পোকা। অর্থাৎ দরজার বাইরে নরকের কীটদের আগমন ঘটেছে। আমার মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল। কারা যেন অন্তরাল থেকে আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে দরজা খোলার! আমি দরজার ছিটকিনিটা খুলতে গেলাম! পিছন থেকে বিল্টুর ভয়ার্ত আর্তনাদ কানে ঢুকছে না। কেউ যেন আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো অকেজো করে দিয়েছে!

আচমকা আমার পকেটে থাকা মোবাইলটা কর্কশ শব্দে চিৎকার করে উঠল। যার ফলে হঠাৎ পুনরায় ইন্দ্রিয়গুলো সচল হয়ে উঠল। দু' পা দরজা থেকে পিছিয়ে এসে ফোনটা কানে ঠেকালাম। দরজার শব্দের জন্যে কানে চেপে ধরলাম মুঠোফোনটা।

ছেলের উত্তেজিত কণ্ঠ ভেসে এল, 'অনেক চেষ্টায় এইমাত্র লাইন পেলাম। মায়ের সকাল থেকে প্রচন্ড জ্বর। এখন টেম্পারেচার চার ছাড়াল। ভুল বকছে। আমি একা...।'

'চিন্তা করিস না। আমি আসছি।' কথার মাঝে লাইন কেটে গেল। দরজায় ধাক্কার শব্দ উপেক্ষা করে বাস্তবে ফিরে এলাম। পিছন ফিরে দেখলাম আমার থেকে হাত তিনেক দূরে দাঁড়িয়ে বিল্টু ভয়ে কাঁপছে। ওর কাছে এসে কাঁধে ঝাঁকুনি দিলাম।

'তোর বৌদির খুব জ্বর। ছেলে একা। আমায় এখুনি ফিরতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি। আমি সাইকেলের কাছে যাচ্ছি। তুই ওদের বলে আয়।'

এখান থেকে যাওয়ার কথা শুনে ওর শরীরে যেন প্রাণ ফিরে এল। ও ছুটল বাড়ির ভেতরে। যাওয়ার আগে শেষবারের জন্যে ঐ নরকের দরজার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালাম। এতদিন যাদের কথা লিখতাম তারা যে আমার এত কাছাকাছি আসবে কোনোদিন কল্পনা করিনি। যতই আমি সাহসী হই না কেন খিড়কি দরজা

খুলে ওদের সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা বা সাহস এখনও সঞ্চয় করতে পারিনি। পীরবাবা জীবিত নেই। কিন্তু তার সহকারী রফিক আছে। আজ যদি ও সাথে থাকত? নিশ্চয়ই দরজা খুলে ওদের ভয়াল ভয়ঙ্কর রূপ দেখতাম।

স্ত্রীর কথা মনে হতে জোরে পা চালালাম সাইকেলের দিকে। ঘড়িতে সময় সন্ধ্যে সাতটা। জানিনা কতক্ষণে বাড়ি পৌঁছতে পারব। এখনও কানে আসছে দূর থেকে দরজা ঠেলার শব্দ! বিল্টু আর আমি ফিরে চললাম ওদের বাড়ির দিকে মনে একরাশ ভৌতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে। জানি না পাল বাড়ির বাসিন্দাদের কপালে কী লেখা আছে!

বিল্টুর বাড়ি এসে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম। বিল্টু ভ্যান রিক্সা নিয়ে স্টেশনে এল। বারণ করা সত্ত্বেও শুনল না। না খেয়েদেয়ে পুজোর দিনে চলে আসছি বলে ওদের মন খারাপ। কিন্তু স্ত্রীর কথা মনে করে আটকাতে পারল না। ট্রেনে ওঠার আগে বিল্টুকে বললাম, 'যেমন করে পারিস পাল বাড়ির খবর আমাকে দিবি...।'

'তুমিও বৌদির খবর জানাবে।' ট্রেনে উঠে পড়লাম। ফাঁকা ট্রেনে বসে কয়েকটা কথা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এক নম্বর হল, এই মুহূর্তে পাল বাড়িতে কী হচ্ছে? দ্বিতীয়, স্ত্রীর অসুখের কথা। তাহলে কি ঈশ্বর স্ত্রীর অসুখের অজুহাতে ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে আমাকে সরিয়ে আনলেন?

একাদশীর দিন স্ত্রীর জ্বর কমল। ভাইরাল ফিভার। এর মধ্যে বিল্টু এক সেকেন্ডের জন্যে লাইন পেয়ে তার বৌদির খোঁজখবর নিয়েছে। আর কোনো কথা হয়নি। আমি উৎকণ্ঠায় আছি। এ ছাড়া কাহিনীটা সম্পূর্ণ করা দরকার।

কয়েকদিন পরে বিল্টুর ফোন পেলাম। জানাল সেই রাত্রে আরও কিছুক্ষণ ধাক্কাধাক্কি চলার পর শব্দ থেমে যায়। নির্মলকে কোনোরকমে জোর করে ঘরে আটকে রেখেছিল ওরা। বড় ভাই পাটনায় ছেলেকে ফোন করে, বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে ওরা ছেলের কাছে চলে গেছে।

বুঝলাম, আরও একটা অভিশপ্ত বাড়ির সংখ্যা বাড়ল।



পিন্ডদান

সঞ্জিতের কয়েকদিন ধরেই ভয় ভয় লাগছিল। আর কয়েকদিন বাদেই তার অপারেশন। পেটের যন্ত্রণার কারণে ডাক্তার দেখানো। শেষে ধরা পড়ল পেটে টিউমার। বেশ বড় আকার ধারণ করেছে। ও নিজেও বুঝতে পারেনি। কতই বা বয়স ওর... বড় জোর চব্বিশ। নিজের গাফিলতির জন্যে এই অবস্থা! মুঠো মুঠো পেন কিলার খেয়েছে। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান।

জলপাইগুড়ির নার্সিং হোমেই ডা. সোম অপারেশনটা করবেন। বাবা চেয়েছিল কলকাতায় গিয়ে অপারেশন হোক। কিন্তু ডা. সোম সাহস দিলেন। তাই ওরা রাজি হল। আজ বুধবার, ডাক্তার শনিবার অপারেট করবেন। শুক্রবার বেলায় ভর্তি হতে হবে। কেমন যেন একটা নার্ভাস লাগছে ওর। যদি অপারেশন সাকসেসফুল না হয়? ডাক্তার যতই আশ্বাস দিক না কেন... যার হয় সে-ই একমাত্র বুঝতে পারে।

কত রকম বাজে চিন্তা মাথায় আসে! যদি সে মরে যায়? এই সুন্দর পৃথিবীর আলো যদি আর দেখতে না পায়? সে মরে গেলে বাবা-মায়ের কী হবে? তাছাড়া আর একটা চিন্তা তাকে বেশি ভাবাচ্ছে। আগামী মাসে নতুন চাকরিতে জয়েন করার কথা। হায়দ্রাবাদে একটা নামজাদা কোম্পানি। ফ্লাইটের টিকিট কাটাও কমপ্লিট।

ডাক্তারবাবু অবশ্য বলেছেন, একটু ডিফিকাল্ট সার্জারি হলেও দিন বারোর মধ্যে ফিট হয়ে যাবে সঞ্জিত। কে জানে কতটা সত্যি?

শুক্রবার ওরা নার্সিং হোমে এল। তার আগেই ওর গ্রুপ অনুযায়ী ব্লাড নার্সিংহোম জোগাড় করে রেখেছে। মা যাওয়ার আগে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে গেল। বাবা ওর জন্য কেবিনের ব্যবস্থা করেছে যাতে ছেলের কোনো অসুবিধে না হয়!

কাল সকাল দশটায় অপারেশন হবে। প্রায় ঘন্টা দেড়েকের ব্যাপার। বিকেল থেকেই ওর খাওয়া বন্ধ। স্যালাইন দেওয়া শুরু হল। ওর কেবিনের ঘড়িতে রাত দশটা বাজছে। এখন একাই রয়েছে সঞ্জিত। মাথার মধ্যে চিন্তাগুলো হুটোপাটি করছে। এখন এই শান্ত পরিবেশে সেগুলো যেন আরও প্রকট হয়ে উঠছে। খালি মনে হচ্ছে আজকের রাতটাই তার জীবনের অন্তিম রাত! ডাক্তারের প্রতিশ্রুতিও কেমন জোলো ঠেকছে! মনটা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে।

এটা তো তার পক্ষে ভালো লক্ষণ নয়। সঞ্জিত চেষ্টা করল মনকে শক্ত করতে। কত বড় বড় জটিল অপারেশন নির্বিঘ্নে হয়ে যাচ্ছে। এই তো রাঙা মামার ওপেন হার্ট সার্জারি হল কিছুদিন আগে। এখন দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে সে। এখন মনে হচ্ছে সিঙ্গেল কেবিন না নিলেই ভাল হত। তবু অন্য রোগীর সঙ্গে কথা বললে এইসব ছাইপাঁশ চিন্তাগুলো মাথায় আসত না।

এই সময় একজন নার্স ঢুকল। সে স্যালাইনের বোতলটা চেক করে বলল, 'রাতের আয়া আসবে, যদি কিছু দরকার লাগে বলবেন।' সঞ্জিত এবার একটু চোখটা বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল। নতুন একটা ভাবনা মনে উদয় হল। এই কেবিনে এর আগেও অনেক রোগী এসেছে। তার মধ্যে সবাই কি বেঁচে ফিরে গেছে?

ব্যস... শুরু হয়ে গেল নতুন এক কাহিনী। তার আত্মা যদি এখনও এখানে থেকে থাকে? ভয়ে ভয়ে চোখ খুলে ঘরের চারদিকে দেখতে গিয়ে মনে হল দমটা আটকে গেল! ঘরের কম আলোয় দেখল জানলার কাছে টুলে বসে একটা সবুজ পাড়ওয়ালা সাদা শাড়ী পরা একটা মেয়ে। মুখটা অন্ধকারে ঢাকা। বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছে। উঠে বসতেও শক্তি পাচ্ছে না। হাত-পা ঠান্ডা লাগছে। মুখ দিয়ে অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল, 'কে? কে ওখানে?' গলার স্বরটা ভেঙ্গে গেল।

ওর গলার আওয়াজে মেয়েটা ধীরে ধীরে মাথা তুলে সঞ্জিতের দিকে তাকাল। মিষ্টি গলায় বলল, 'কী হল, ভয় পেয়েছেন নাকি?'

মনে অল্প সাহস ফিরে এল। নিজের মনেই লজ্জিত হল। এই তাহলে রাত্রের আয়া। ওর চোখ বন্ধ থাকাকালীন নিশ্চয়ই এসে বসেছে! আমতা আমতা করে বলল, 'ঘরের বড় আলোটা জ্বালিয়ে দিন।'

মেয়েটা উঠে আলোটা অন করল। মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অপারেশনের আগে মনটা একটু দুর্বল হয়। ভয় নেই। ঘুমোন, আমি আছি। টুলে বসে বই পড়ছি।'

এবার সত্যিই লজ্জা লাগল। কী ভাবল মেয়েটা কে জানে? সঞ্জিতের থেকে বয়সে ছোট। চোখটা বন্ধ করল। বইয়ের পাতা ওল্টানোর শব্দে বুঝল মেয়েটা আবার বই পড়ায় মনোযোগ দিয়েছে।

চোখ বুজে সঞ্জিত ভেবে চলে, আজ বাদে কাল ও চাকরি করতে যাচ্ছে। সেখানে একাই থাকতে হবে। আর এইটুকুতেই ভয় পেয়ে যাচ্ছে! উল্টে ঐ কমবয়সী আয়াটাই জ্ঞান দিয়ে দিল। চোখ পিটপিট করে তাকাল। একমনে বই পড়ছে মেয়েটা। সাদা শাড়িতে ছিপছিপে শরীরটা যেন চোখটা টানে। ওর মায়াবী চোখ দুটো বড় সুন্দর। এখনও কোনোদিন কোনো মেয়ের সাথে তার ভালোবাসা হয়নি। এই মুহূর্তে ঘরে ওরা শুধু দু'জন। তবে কি ও মেয়েটাকে ভালোবাসতে শুরু করে দিয়েছে? পরক্ষণেই নিজের মনকে সংযত করে। মাথা থেকে পাগলামিটা দূর করে। মনে হচ্ছে এবার ঘুমটা আসছে।

হাতের ওপর কোমল স্পর্শ পেয়ে ঘুমটা পাতলা হল। চোখ মেলতেই একেবারে মুখের সামনে মেয়েটাকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠল! মনে হল ওর গলাটা টিপতে আসছে!

'চমকে উঠলেন কেন?' মৃদু হাসল মেয়েটা, 'এইরকম ভীতু ছেলে আগে দেখিনি।' সঞ্জিত দেখল স্যালাইনের খালি বোতলটা ও বদলাতে এসেছে।

'মোটেই ভয় পাইনি।' সতেজ কণ্ঠ সঞ্জিতের। 'ঘুমের ঘোরে ছিলাম তাই।'

মেয়েটা মিষ্টি গলায় বলল, 'বাথরুম যাবেন? কেননা এরপর নতুন স্যালাইনের বোতল লাগাব।' সঞ্জিত ঘড়িটা দেখল। এগারোটা কুড়ি। ও সম্মতি জানাল। কিন্তু মেয়েটাও কি ওর সঙ্গে বাথরুমের ভেতরে যাবে নাকি? তাহলে তো লজ্জায় বাথরুম করতেই পারবে না।

মেয়েটা বোধহয় ওর মনের ভাব বুঝতে পারল। তাই বলল, 'আপনি একজন রোগী হিসেবেই নিজেকে মনে করুন। তাহলেই লজ্জাটা কেটে যাবে। তাছাড়া আমি চোখ বন্ধ করে থাকব।'

সঞ্জিতের হাতটা সন্তর্পণে ধরে ওকে উঠতে সাহায্য করল মেয়েটা। টয়লেটে এসে দাঁড়াল ওরা। আয়া চোখ বন্ধ করে বলল, 'নিন, আমার চোখ বন্ধ।' পাজামার মতো নার্সিং হোমের ড্রেসটার চেন খোলার সময় ওর চোখ বাথরুমের আয়নাটার দিকে পড়তেই চোখে অন্ধকার দেখল। মাথার ক্ষুদ্র গ্রে সেলগুলো উত্তেজিত হয়ে ওকে বিপদের আগাম নোটিস দিল। দুনিয়ার আতঙ্ক ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ইন্দ্রিয়গুলো টুকরো টুকরো করতে শুরু করল! বাথরুমের আয়নার দিকে রক্তশূন্য মুখে ও তাকিয়ে দেখছে, শুধুমাত্র সঞ্জিত একাকী দাঁড়িয়ে! মেয়েটার চিহ্ন মাত্র নেই!

কাঁপা চোখে পিছন ফিরে তাকাতেই সারা শরীর হিম হয়ে গেল। মেয়েটা চোখ বুজে ওর পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে! এত কাছে যে ওর নিঃশ্বাস ঘাড়ের ওপর পড়ছে। ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে আরও একবার আয়নার দিকে তাকাল। আয়নার ভেতর সঞ্জিত ছাড়া আর কেউ নেই!

ওর মস্তিস্ক ক্রমশ ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে। দু'চোখ জুড়ে কালো আঁধার ছাইছে। পায়ের জোর কমে যাচ্ছে। শেষ বার ওর মগজ জানিয়ে দিল ওর সাথে যে রয়েছে সে মানুষ নয়। এটা জানার সঙ্গে সঙ্গেই ও চেতনা হারাতে শুরু করল। মুখ দিয়ে একটা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল।

হাঁটু ভেঙে মাটিতে পড়ার আগে দুটো শক্ত হাত ওকে জড়িয়ে ধরল। অস্পষ্ট একটা শব্দ কানে এল, 'ডাক্তারবাবু, তাড়াতাড়ি আসুন... পেশেন্ট জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে।'

জলের ঝাপটায় জ্ঞান ফিরল সঞ্জিতের। চোখে পড়ল ডাক্তারের সাথে নার্সদের উদ্বিগ্ন মুখ। ডাক্তার প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার? আপনি একা একা টয়লেটে গেছেন কেন? তাও আবার স্যালাইনের সিরিঞ্জ খুলে? রাতের আয়া তো বাইরেই বসে ছিল।'

রাতের আয়া বলল, 'ভাগ্যিস একটা গোঙানির আওয়াজ পেয়ে এসেছিলাম! নাহলে বিরাট একটা দুর্ঘটনা ঘটত! আপনিই বলুন স্যার, আর আপনার বাড়ির লোকদের কী জবাব দিতাম?' সঞ্জিতের মুখে কোনো কথা সরছে না! কী বলবে? ঘাড় ঘুরিয়ে একবার টুলটার দিকে তাকাল। নেই... কেউ নেই! শুধু টেবিলের ওপর পাখার হাওয়ায় খোলা বইটার পাতাগুলো ফরফর করে উড়ছে।

বাকি রাতটুকু কীভাবে কাটাবে ও?

আয়া আবার নতুন করে ছুঁচ ফুটিয়ে স্যালাইন চালু করল। সঞ্জিত জানে বাকি রাতটুকু জেগেই কাটাতে হবে। সকালে বাবা এলেই জেনারেল বেডের কথা বলতে হবে। পরক্ষণেই মনে হল মেয়েটা যদি ওখানেও দেখা দেয়? তাছাড়া ওটি-তেও তো থাকতে পারে? বুঝে পেল না কী করা উচিৎ? ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করে চলল। বাবা-মাকে বলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।।

সকালবেলায় সঞ্জিতের বাবা-মা নার্সিং হোমে এল। কিন্তু ছেলেকে দেখে ওরা অবাক হয়ে গেল। এক রাত্তিরে চোখমুখের এ কী অবস্থা হয়েছে ওর? মনে হচ্ছে চিন্তায়, ক্লান্তিতে মুখটা জর্জরিত। রাতারাতি চোখের কোলে এক পোঁচ কালি। মা নির্মলা দেবী উদ্বিগ্ন গলায় বলেন, 'কী হয়েছে তোর? শরীর ভালো আছে তো?' বাবা সূর্যবাবুও চিন্তান্বিত।

সঞ্জিত একটু ভাবল। তারপর ঠিক করল রাত্রের ঘটনাটা বলে দেওয়াই ভাল। এরপর যদি মেয়েটা আবার দেখা দেয়? সে ধাক্কা ও সামলাতে পারবে না...

মিনমিনে স্বরে রাতের ঘটনাটা বলল। ওঁরা দুজনেই একটু চমকালেন। বুঝতে পারছেন না কতখানি সত্যি বা কতটা মনের ভুল? মা ছেলের কথা পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারলেন না। কিন্তু সূর্যবাবুর মনে হল ও নিশ্চয়ই কোনো ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছে!

সঞ্জিত জোর গলায় বলল, 'বিশ্বাস করো তোমরা, আমি এক চুল বাড়িয়ে বলছি না। এরপরেও যদি এই নার্সিং হোমে থাকতে হয়...' ওর মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভয়টা আবার প্রকাশ পেতে শুরু করল। বাবা-মায়ের মুখটাও গম্ভীর হল। ওদের মাথায় আসছে না এই অবস্থায় ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাবে? যার আর ঘন্টাখানেক পর অপারেশন! সূর্যবাবু দোনামোনা হয়ে বললেন, 'বেশ, ডাঃ সোম আসুক। কিন্তু জানি এই হাস্যকর গল্প উনিও বিশ্বাস করবেন না। তাছাড়া এই মুহূর্তে তোকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়াও তো রিস্কের ব্যাপার।'

সঞ্জিতও বাবার চিন্তা আর কথাটা বুঝতে পারছে। নিজের মনটাকে তাই শক্ত করার চেষ্টা করল। দেখা যাক ডাক্তার শুনে কী বলেন?

সাড়ে নটার সময় ডাঃ সোম এলেন। সূর্যবাবু সব বললেন। সোমের মুখে অবাস্তবতার ছোঁয়া, 'হ্যাঁ, আমি নার্সদের মুখে যেটা শুনেছি, তা হল আপনার ছেলে একাই স্যালাইনের নল খুলে বাথরুমে গিয়েছিল। এটা খুব অন্যায়। কিন্তু তখন এসব কথা ও বলেনি।'

সঞ্জিত তোতলাল, 'না মানে — তখন আমার মনের অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না।'

'শোনো, অনেক রোগী সার্জারির আগে একটু দুর্বল হয়ে পড়ে। সেইজন্যে নানা রকম ভুলভাল দেখে। এই হোমে প্রতিদিন কত পেশেন্ট আসছে-যাচ্ছে, কই এই ধরণের কথা কোনোদিন শুনিনি। এইসব কথা পাঁচ কান হয়ে গেলে নার্সিং হোমেরই বদনাম হয়ে যাবে। তুমি আজকালকার ছেলে হয়ে... প্লিজ় সঞ্জিত, মন থেকে ভুল ধারণা ছাড়ো।' ডাক্তার সোম তো ছোটখাটো একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন। এরপর আর কী বলার থাকতে পারে? সত্যি কি তার মনের ভুল? স্বপ্ন কখনও এত জ্যান্ত হয়? ও দোটানায় পড়ে যাচ্ছে।

ডাক্তার ওর প্রেশার আর হার্ট বিট চেক করে গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে বললেন, ‘দেখো, কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ভুলভাল চিন্তা আর সারারাত না ঘুমিয়ে প্রেশারটাকে হাই করে তুললে!’ সূর্যবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘ও এত নার্ভাস বুঝতে পারিনি। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে অপারেট করা ঠিক হবে না। ওর শরীরের অবস্থা একটু স্থিতিশীল হোক। খুব ঝামেলায় পড়া গেল।’ সঞ্জিত বাবার মুখেও বিরক্তি দেখল। শেষে ঠিক হল বিকেল পাঁচটা নাগাদ অপারেশন হবে। ডাক্তার নার্সকে কয়েকটা ওষুধ আর ইনজেকশন লিখে দিয়ে চলে গেলেন।

মা-বাবা দুজনেই ওকে বোঝালেন। নির্মলা দেবী ঠাকুরের ফুল এনেছিলেন। ছেলের বালিশের নিচে রেখে বললেন, ‘আর ভয় লাগবে না। তুই বরং ঘুমোবার চেষ্টা কর...’ সঞ্জিত ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘হয়ত আমার মনের ভুল! যাক, ভাবনা করবে না। বিকালে চলে এস।’ এইসময় নার্স সিরিঞ্জ নিয়ে ঘরে ঢুকল। ইঞ্জেকশন নেবার দু’মিনিটের মধ্যেই চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। গভীর ঘুমের মধ্যে সঞ্জিত প্রবেশ করল।

বিকেলে ওর ঘুম ভাঙল। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। মাথাটাও একটু হালকা। মা-বাবার সাথে ডাক্তারও কেবিনে ঢুকলেন। সোম সবকিছু দেখে হেসে বললেন, ‘এই তো ইয়ং ম্যান একেবারে ফিট। আর ঘন্টাখানেকের মধ্যে তোমার শরীর থেকে ঐ আবর্জনার তালটা বাদ দিয়ে দিলেই দু’দিনের মধ্যে চাঙ্গা হয়ে উঠবে।’ সঞ্জিতের মনে সাহসটা ফিরে আসতে শুরু করল।

‘কিন্তু একটা কথা স্যার।’ ও বলল, ‘সার্জারির পর আমাকে জেনারেল বেডে রাখবেন!’

একটু কী ভেবে সোম বললেন, ‘...ওয়েল তাই হবে।’ পনেরো মিনিটের মধ্যে ওকে রেডি করে ওটি-তে নিয়ে গেল। জীবনে এই প্রথম অপারেশন থিয়েটারে ও ট্রলি চেপে প্রবেশ করল।

তখনও সঞ্জিত জানত না, ওর জন্য কী অভিজ্ঞতা ওখানে ওঁৎ পেতে রয়েছে!

সঞ্জিত চোখ মেলে চারধার দেখল। নানাবিধ ডাক্তারি অত্যাধুনিক যন্ত্র। যার অর্ধেক নাম ও জানে না। ওকে যে টেবিলে শোয়ানো হল তার একটু উঁচুতে জোরালো আলোর সমাহার। মনে হয় ওর অপারেশনটা অল্প জটিল। কেননা সোম ছাড়াও দু’জন ডাক্তার রয়েছেন। এছাড়া দু’জন নার্স। সবাইয়ের মুখে কাপড়ের মাস্ক বাঁধা। পাশেই একটা সরু টেবিলে অজস্র বিভিন্ন ধরণের কাঁচি, ছুরি, চিমটে। একটা ট্রেতে বান্ডিল বান্ডিল তুলো।

এইসব দেখে মনটা অল্প দুলে উঠল! একজন ডাক্তার এগিয়ে এসে তার কব্জির কাছে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জটা ফোঁটালেন। ওর বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করলেন। সঞ্জিত শুধু রেল কলোনি কথাটাই বলতে পারল। বাকিটা উহ্য থেকে গেল। মনে হতে লাগল একটা উঁচু জায়গা থেকে কে যেন অনেক নিচের অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে ফেলে দিল। শরীরটা হালকা থেকে হালকাতর হয়ে চলল। ক্রমশ ও অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আশপাশের যে ছুরি-কাঁচির শব্দগুলো কানে আসছিল তাও এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

একেই কি অজ্ঞান করা বলে? খুব তো একটা সুখকর নয়! মনে হচ্ছে কেউ ওর নাকে-মুখে রবারের কিছু পরিয়ে দিচ্ছে! বুকের মধ্যে বাতাসটাও যেন কমে আসছে — হাঁ করে একটু বাতাস নেবার চেষ্টা করতেই একটা কি রকম গা গোলানো গন্ধ নাক-মুখ দিয়ে দেহে ঢুকল। তার সাথে সাথেই ও পুরো চেতনাটাই হারিয়ে ফেলল।

কতক্ষণ... কত সময়... ও কালো কুচকুচে মেঘের মধ্যে সাঁতার কেটেছে জানে না! দূরে, বহু দূরে একটা আলোর বিন্দু চোখে পড়ছে। এতক্ষণ বাদে ও আলো দেখতে পেল। আলোর বিন্দুটা ক্রমশ বড় আকার ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে একটা আবছা আলোর সৃষ্টি হচ্ছে। যার ফলে অন্ধকারটা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। আলোর প্রাণী আলো ছাড়া অন্ধ। সত্যি অন্ধদের কী কষ্ট! এখন নতুন করে বুঝতে পারছে। ওর মনটাও আস্তে আস্তে সচল হচ্ছে।

মস্তিস্কটাও কিছুটা কাজ করছে। কেননা মনে পড়ছে ওর অপারেশন হচ্ছিল। সেটা কি শেষ হয়ে গেছে? না এখনও শুরু হয়নি? মাথাটা এখনও সম্পূর্ণ সক্রিয় হয়নি বলেই চিন্তাগুলো জুড়ছে না। মাঝপথেই ভেঙ্গে

যাচ্ছে। জিভটা খুব শুকনো ঠেকছে। বড্ড তেষ্টা পাচ্ছে। একটু জল পেলে ভাল হত। কাউকে ডেকে বলবে? কিন্তু আশপাশে অস্পষ্ট আঁধারে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তবে কি ওকে ওটি-তে ফেলে রেখে সবাই চলে গেল!

এবার সেই পুরোনো ভয়টা হঠাৎ করে মনে ফিরে আসছে। তার সঙ্গে ফিরে আসছে সেই ছিপছিপে ফর্সা শরীরটা। যাকে অনেকটা সময় ধরে ও মন আর মাথা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। মনে হচ্ছে সেই অশরীরীর অপেক্ষার বাঁধ ভেঙে গেছে! অন্ধকারের দেওয়াল ভেদ করে সে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তার সেই সবুজ পাড়ওয়ালা সাদা শাড়ি পরা দেহটা এক পা এক পা করে সঞ্জিতের দিকে এগিয়ে আসছে। মৃত্যুর গহ্বর থেকে ফের মাথা তুলেছে সেই মৃতা! সঞ্জিতের সারা শরীরে হিম শীতল স্পর্শ অনুভূত হচ্ছে।

সেই আলোর বিন্দুটাও যেন স্থির হয়ে গেছে। তাই ঐটুকু আলো চারিদিক আলোকিত করতে সক্ষম হচ্ছে না। তবে কি আবার সে স্বপ্ন দেখছে? জোর করে চোখের পাতাগুলো খোলার চেষ্টা করতেই ও অবাক হয়ে গেল। এ কি! অদ্ভুত ব্যাপার! ওর চোখের পাতা দিব্যি নড়াচড়া করছে! তার মানে সঞ্জিত জেগেই আছে। ওর অনেক আগেই জ্ঞান ফিরে এসেছে! তাহলে ওর অপারেশন শেষ হয়ে গেছে! ওকে তার মানে সেই পুরোনো অন্ধকার কেবিনটাতেই শুইয়ে দিয়ে গেছে? ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখার চেষ্টা করল। সবই যেন অস্পষ্ট — পরিষ্কার কিছু নয়। অ্যানেসথেসিয়ার প্রভাব কি এখনও কাটেনি?

চোখ দুটোকে বড় বড় করে দেখার চেষ্টা করতে আবছা ভাবে চোখে পড়ল অপারেশন ঘরটা। তার টেবিলেই ও শুয়ে আছে। এক ঝটকায় মস্তিস্কটা সচল হল এবং তখনই হৃৎপিন্ডটা কেঁপে উঠল। কেননা চারিদিকে আবছা দেখার কারণটা ও অনুভব করতে পারল। একটা সাদা চাদর দিয়ে ওর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা! তবে কি ও মরে গেছে? না হলে এভাবে চাদর দিয়ে ওর দেহ ঢাকা কেন? হাতের ঝটকায় মাথা থেকে চাদরটা সরাতেই অপারেশন চেম্বারটা চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠল। ঐ তো চারিদিকে রক্ত মাখা ছুরি, কাঁচি ছড়ানো। পেঁজা পেঁজা রক্তে মাখানো তুলো! কিন্তু ঘরের অতগুলো উজ্জ্বল আলো কোথায় গেল? সেখানে ছোট একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। ডাক্তার বা নার্সরাই বা কোথায় গেল? এখানে ওকে একা ফেলে দিয়ে কেন চলে গেছে?

একটু উঠে বসতে গিয়ে পেটের কাছটায় একটা বিরাট যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠল! ঘাড় উঁচু করে পেটের দিকটায় দৃষ্টি পড়তেই মনে হল অ্যানেসথেসিয়া ছাড়াই ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে! ওর পেটটা দু' ফালা করে কাটা! ভেতরের নাড়িভুঁড়িগুলো লাল রক্তে দগদগ করছে। ওরা সেলাই পর্যন্ত না করে চলে গেছে!

এই সময় একটা কনকনে ঠান্ডা হাতের স্পর্শ কপালে পেল। এক লহমায় সারা শরীরের তাপমাত্রা মাইনাস ডিগ্ৰীতে নেমে গেল। মনে হচ্ছে হিম শীতল ঠান্ডায় দাঁতে দাঁত লেগে যাবে। ওর ভয়ার্ত চোখ দুটো সামনেই মেয়েটার ফ্যাকাশে মুখটা দেখতে পেল। বড় জোর আধ হাত দূরে দাঁড়িয়ে। ওর শীর্ণ হাতটা সঞ্জিতের কপালে ঠেকানো!

বিড়বিড় করে মেয়েটা বলল, 'তোমার জল তেষ্টা পেয়েছে? আমিও বড় তৃষ্ণার্ত।'

ছুটে টেবিল থেকে নেমে দরজার কাছে পালাতে গিয়েও সেকেন্ডেরও কম সময়ে মগজ সাবধান করে দিল। সাবধান — তোমার কাটা পেট থেকে সমস্ত নাড়িভুঁড়ি মেঝেতে পড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে! নিজেকে সংযত করল। এইরকম বিপদের মধ্যে কোনোদিন কেউ পড়েছে বলে ও মনে করতে পারল না। মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠল যা ওর শরীরের রক্ত চলাচলকে বোধহয় থামিয়ে দিল।

ভাঙা গলায় সঞ্জিত কোনো রকমে বলল, 'আমি কোথায়?'

দূর থেকে যেন মেয়েটার কণ্ঠস্বর কানে এল, 'তুমি-আমি এখন একই জায়গায়। আমাদের এখন কেউ বিরক্ত করতে পারবে না।'

সঞ্জিত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে এই সরল কথাটার মানে বুঝে যেত। কিন্তু এই মুহূর্তে বুঝতে পারল না। তাই আরও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পড়ল।

সঞ্জিত ভয়ের গলায় বলে উঠল, 'ডাক্তাররা আমায় ফেলে কোথায় গেল?'

মেয়েটা ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'ওরা এখানে থেকে আর কী করবেন? ওদের আর কিছু করার নেই। অবশ্য একটু বাদে এসে তোমার পেটটা সেলাই করে দিয়ে যাবে। তারপর তোমার দেহটা ঠান্ডা ঘরে ঢুকিয়ে দেবে। যেমন আমাকেও করেছিল।'

সঞ্জিত এবার শিউরে উঠল। সে মৃত! এই কথাটা এবারে মগজে ঢুকল, 'না আমি মরতে চাই না। আমাকে ছাড়া মা-বাবা বাঁচবে না।' গলা চিরে হাহাকার বেরিয়ে এল। মেয়েটা আরও কাছে সরে এল। তার সঙ্গে ঠান্ডাটাও বাড়ল।

'তুমি তো তবু কাছে আমাকে পাচ্ছ। আর আমি? এই কালো অন্ধকার জগতে সম্পূর্ণ একা! উঃ! কী অমানুষিক যন্ত্রণা!' মেয়েটার গলায় হারানোর সুর।

এই প্রথম সঞ্জিত মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল। সারা মুখটাতে একটা পাতলা সাদা চামড়া দিয়ে ঢাকা। এত পাতলা চামড়া যে ওর মুখের ভেতরের হাড়গোড় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মনের ভয়টাকে দমিয়ে বলল, 'তুমিও কি এই নার্সিংহোমে মারা গেছিলে?' সেই আয়ারূপী যুবতী মহিলা হাওয়ায় ভর দিয়ে ওর টেবিলে উঠে বসল। চারিদিকের শীতলতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

— 'তোমার কেবিনের বেডে আমার মৃত্যু হয়েছে মাস চারেক আগে। তোমারই মতো এই কাটা ছেঁড়ার টেবিলে। সেই থেকে এইখানেই রয়েছি। যদি কোনো সঙ্গীসাথী পাই।'

কথাগুলো ওর কান দিয়ে ঢুকে সারা দেহটাকে বরফের চাদরে মুড়ে দিল। নিজের মরার কথা বিশ্বাস করতে মন চাইছে না! কিন্তু চারপাশের পরিবেশ ওকে মানতে বাধ্য করছে।

— 'আমার দেহটা নিয়ে ওরা এখন কী করবে?' ও যেন অঙ্ক মেলাতে পারছে না।

— 'তোমার বাড়ির লোকের হাতে তুলে দেবে।'

এবার মোদ্দা কথাটা মাথায় ঢুকে ওকে আরও ম্রিয়মান করে তুলল। বাবা-মায়ের হাতে যখন ওর মৃত শরীরটা তুলে দেবে, সেই দৃশ্যটা ওর সামনে ফুটে উঠল। ওদের কথা মনে পড়তেই বুকটা যন্ত্রণায় গুমরে উঠল। জানে মা সহ্য করতে পারবে না। একমাত্র ছেলের মৃত্যুশোক।

মেয়েটাও করুণ স্বরে বলল, 'আমার বাবা-মা আর দাদাও ভেঙে পড়েছিল। মা এখনও সুস্থ হতে পারেনি। সব থেকে কষ্ট পাই আমরা, যারা মৃত। চোখের সামনে প্রিয়জনদের বুকফাটা কান্না আর হাহাকার দেখতে হয় আর সহ্য করতে হয়!' সঞ্জিত ভাবে এই মেয়েটার সাথে যদি একান্তই তাকে থাকতে হয় তাহলে ওর নামটা জানাও প্রয়োজন।

— 'আমার নাম কাকলী।' মনে পড়ে গেল এই জগতে মনের কথা পড়ে নেওয়া যায়। কিন্তু কই সঞ্জিত তো মেয়েটার মনের কথা পড়তে পারছে না?

'কয়েকদিন কাটুক, আমার মনের কথা তুমিও পড়তে পারবে।' কাকলী ওর কাঁপুনি দেখে বলল, 'বুঝতে পারছি, ঠান্ডা লাগছে। কয়েক ঘন্টা বাদে এটা সহ্য হয়ে যাবে!'

একটা প্রশ্ন ওর মনে জাগল, 'আমি কি ইচ্ছে করলেই মা-বাবাকে দেখতে পারি?'

কাকলী ঘাড় নাড়ল, 'নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে তোমার আরও মনটা ভেঙে যাবে। বিরাট যন্ত্রনা... তাদের দুঃখ, দুর্দশা দেখেও তুমি কিছু করতে পারবে না। বোঝাতেও পারবে না তাদের সামনেই তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ।'

'তাহলে, এই যে ভূত দেখা—'

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়েই কাকলী বলল, 'তার জন্যে অনেক শক্তির দরকার যা এই মুহূর্তে তোমার কাছে নেই। দেখছ তো, এখনও মানুষের শরীরের অনুভূতিগুলো তোমায় ছেড়ে যায়নি। তুমি আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ — তোমার ঠান্ডা লাগছে... তোমার মনটা এখনও মানুষের জগতে পড়ে রয়েছে।'

'এই জগৎ থেকে আমাদের মুক্তি নেই?' চুপ করে রইল সে। বোধহয় এর উত্তরটা এখনো জানেনি।

এই সময় কয়েকজনের মিলিত জুতোর শব্দ দরজার কাছে শোনা গেল। তবে কি ওরা দেহটা নিতে আসছে? কাকলী হঠাৎ হিংস্র গলায় বলে উঠল, 'তোমায় নিতে আসছে ওরা। আমি একটু আড়ালে থাকি।' কথাটার মানে বুঝতে পারল না।

সঞ্জিত সভয়ে দেখল এক নিমেষে হাওয়ায় ভর করে কাকলী ছাদের সিলিঙে উঠে গিয়ে চার হাত-পায়ে সাদা টিকটিকির মতো আটকে রইল! কি ভয়ঙ্কর লাগছে! যেন একটা বড় টিকটিকি লাল লাল চোখ নিয়ে সিলিং থেকে ওকে লক্ষ্য করছে! সঞ্জিত নিজে অশরীরী হয়ে এই সব দৃশ্য দেখে কেন ভয় পাচ্ছে? তবে কি কাকলীর কথা ঠিক? মানুষের স্বভাব, অনুভূতি বদলাতে একটু সময় লাগবে?

কিন্তু কাকলি ভয়ে লুকিয়ে আছে কেন? তবে কি অদৃশ্য হওয়াটা এখনও পুরোপুরি রপ্ত করতে পারেনি? কোনো উত্তরই মেলাতে পারছে না। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। ও কান খাড়া করে শব্দটার গতিবিধি শুনতে লাগল।

জুতোর শব্দটা দরজার কাছ থেকে আবার দূরে চলে যাচ্ছে। তবে কি এখন ওরা দেহটা নিয়ে যাবে না? এবার নতুন একটা উপলব্ধি ওর শরীরে প্রবেশ করতে শুরু করল। শীতের ভাবটা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। কাকলীর কথা ফলতে শুরু করল তাহলে? ও বলেছিল, একটু বাদেই এই জগতের আবহাওয়ার সঙ্গে তোমার আত্মা মানিয়ে নেবে!

এছাড়াও একটা নতুন ভাবনা মাথার এক কোণে ঝিলিক দিল! ঠান্ডা কমে যাবার আরেক অর্থ হচ্ছে তার শরীরের রক্ত গরম হতে আরম্ভ করেছে! একটা ক্ষীণ আশা, যদি সে পুনর্জীবন পায়? কথাটা মাথায় আসতেই মনে একটা আনন্দের জোয়ার খেলে গেল। ইস যদি তাই হত?

সঞ্জিতের হঠাৎ ছাদের দিকে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেল। কাকলীকে কোথাও দেখতে পেল না। আশ্চর্য, এই তো একটু আগেই টিকটিকির মতো আটকে ছিল! ঘরের আলোটা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। তাহলে আলোর জন্যে ও অদৃশ্য হয়ে গেছে। অন্ধকারের জীব আলো সহ্য করতে পারে না। সঞ্জিত নিজে পারছে কি করে? ওরও তো মৃত্যু হয়েছে।

চারিধার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে চলেছে। আহা কি সুন্দর আলো! আলোর এত রূপ আগে ও কোনোদিন বুঝতে পারেনি। একটা গুঞ্জনধ্বনি কানে আসছে মনে হচ্ছে! ও কানটা যথাসম্ভব খাড়া করল। হ্যাঁ একটা অস্পষ্ট, সম্মিলিত কথার আওয়াজ ও শুনতে পাচ্ছে। মানুষের কথার শব্দ! ওহ, কী মধুর! রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ দেখার জন্যে ওর শরীর-মন ব্যাকুল হচ্ছে।

মানুষের চেঁচামেচি, কোলাহল সঞ্জিতের চিরদিনই অপ্রিয়। আর আজ এই মুহূর্তে মনের একটাই ইচ্ছে যে কোনো মানুষের উপস্থিতি। এই সময় শরীরে একটা মৃদু ধাক্কা লাগল। আবার কি কাকলী ফিরে এল?

তাকাতেই আলো ঝলমল নার্সিংহোমের জেনারেল বেডগুলো চোখে পড়ল। এর পরেই দেখতে পেল বাবা-মায়ের উদ্বিগ্ন মুখ। পাশেই দাঁড়িয়ে ডা. সোম। সোমের ভরাট কণ্ঠ কানে এল, 'হ্যালো ইয়ংম্যান, এই তো সেন্স ফিরে এসেছে। অপারেশন সাকসেসফুল।' বাবার মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। মায়ের কোমল হাতের স্পর্শ কপালে পেল। একটা সুন্দর ভালোলাগা মন থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। মা বলছে, 'বলেছিলাম, ঠাকুরের ফুল আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ও তাহলে নতুন জীবন ফিরে পেল! মনে পড়ছে অভাগী কাকলীর কথা। সে তো রয়ে গেল ঐ অন্ধকারের জগতে একা। বড় একা! এখন ভয়ের থেকে ওর প্রতি করুণাটাই বেশি হচ্ছে। যদি কোনো মন্ত্রবলে ওকেও এই আলোর দুনিয়ায় ফেরানো যেত!

কয়েকদিন সঞ্জিত জেনারেল বেডেই রইল। ও মনে মনে চাইত একবার যেন কাকলী আসে। কিন্তু নিরাশ হল। এবার সে ধরে নিল ডাঃ সোমের কথাই সত্যি। ওর মনের ভ্রম। সেই ধারণা নিয়েই সে নার্সিং হোম ছাড়ল।

নতুন চাকরি হায়দ্রাবাদে জয়েন করার আগে কয়েক বার খোঁজ খবর নিল। কিন্তু নিরাশ হল। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ কিছু জানাতে পারল না। তারপর একদিন জলপাইগুড়ি ছাড়ল নতুন চাকরীর উদ্দেশ্যে।

এরপর থেকে ও কাকলীকে একদিনের জন্যেও স্বপ্নে দেখেনি। মন থেকে ধীরে ধীরে ঐ নামটা ফিকে হয়ে যেতে শুরু করল। ওখানে গিয়ে অর্ণবের সাথে পরিচয় হল। ওদের কোম্পানীতে চাকরি করে। আলাপ জমতে বেশি দেরী হল না। কেননা একে বাঙালী, তার ওপর শিলিগুড়ির ছেলে।

ওদের কোম্পানী দূর্গাপুজোয় ছুটি দেয় না। বরং দেওয়ালিতে কয়েকদিন বন্ধ থাকে। একেই নতুন চাকরী, মনটা খারাপ হয়ে গেল। কালীপুজোয় বাড়ি গিয়ে কী হবে? তাও যদি নিজের বোন থাকত, ভাই ফোঁটা নেওয়া যেত। ঐ বিশেষ দিনটাতে সত্যি মনটা খারাপ লাগে।

অফিসে বসে অর্ণবের সাথে এই নিয়েই আলোচনা করছিল। 'আমার তো বোন নেই। তোমার নিশ্চয়ই আছে?' ওর কথাটা শুনে অর্ণবের মুখে একটা দুঃখের ছায়া পড়ল।

'ছিল। এখন আর নেই। সাত-আট মাস আগে গলব্লাডার স্টোন অপারেশন করতে গিয়ে মারা গেছে।' পার্স থেকে বোনের ফটোটা বার করতেই সঞ্জিতের সামনে গোটা দুনিয়াটা দুলে উঠল। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই গড়ন। বিড়বিড় করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল — 'কা-ক- লী!' অর্ণব বিস্ময়ে ওর দিকে তাকায়।

'তুমি চিনতে নাকি আমার বোনকে?'

কী উত্তর দেবে সঞ্জিত? মরার পর তোমার বোনকে দেখেছি? তার সঙ্গে কথা বলেছি? সেটা বিশ্বাসযোগ্য হবে?

তাই কোনোরকমে বলল, 'আমার বন্ধুর বোনের মতো দেখতে। তার নামও কাকলী।' এতদিন বাদে যেন তার মনের অঙ্ক মিলে গেল। এবার চেষ্টা করতে হবে কাকলীকে ঐ অবস্থা থেকে যদি মুক্তি দেওয়া যায়! তার জন্য ওকে গয়া পর্যন্ত যদি যেতে হয়... অবশ্যই যাবে। সঙ্গে অর্ণবকে নিয়ে।

তাহলে সত্যি আর একটা অদৃশ্য জগৎ আছে! যেখানে আমাদের সবাইকে কোনো না কোনো এক দিন পা রাখতেই হবে।

অর্ণব আর সঞ্জিত মিলে ঠিক করল সামনেই কালী পুজো। ঘোর অমাবস্যা। খুব ভালো দিন। ঐ দিনেই অর্ণবের মৃতা বোন কাকলীর অতৃপ্ত আত্মার শান্তিলাভে গয়ায় গিয়ে পিন্ডদান করবে। যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করল। বাড়িতে কিছু জানাল না। কেননা অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

অর্ণব বলল, 'আমরা পিন্ডদানের বিষয়ে কিছুই জানি না। কোথায়, কীভাবে দিতে হয়?'

'চিন্তা কোরো না। আগে গয়ায় পৌঁছোই! তারপর ব্যবস্থা। আর হ্যাঁ, ওখানে গিয়ে আবার যাকে তাকে প্রশ্ন করো না। শুনেছি খুব পান্ডার উৎপাত। ভালোরকম টাকা খিঁচে নিতে পারে!'

ওরা প্রথমেই অফিসে ছুটির দরখাস্ত দিল আর কাকলীর একটা ছবি বাঁধাই করে নিল। ওখানে গিয়ে হয়তো কাজে লাগতে পারে!

অর্ণব এখনও বুঝতে পারছে না বন্ধুর এত উৎসাহ কেন ওর বোনের ব্যপারে? কোম্পানীর ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল। দু'বার ট্রেন বদল করে যেতে হবে। কালী পুজোর দিন চারেক আগেই ওরা রওনা হল গয়ার উদ্দেশ্যে।

ট্রেনে অর্ণব সঞ্জিতকে চেপে ধরল, 'সত্যি কথা বলবে ভাই? কাকলীর পিন্ডদানের ব্যপারে তোমার উৎসাহের কারণটা যদি একটু বলো। অনেকদিন ধরেই জিজ্ঞেস করব করব করছি।' সঞ্জিত আর এড়াতে পারল না। অপারেশনের আগে আর পরের ঘটনাটা খুলে বলল।

অর্ণব ভয়মিশ্রিত মুখে বলল, 'এই ধরণের ঘটনা আজও ঘটে তাহলে? ও আমার নিজের বোন হয়েও তোমাকে দেখা দিয়েছে! আত্মাদেরও গতিবিধি বোঝা দায়...।'

গয়া পৌঁছতে বেশ ধকল গেল ওদের! একটা ছোটখাটো হোটেলে উঠল। স্টেশনেই দু'-একজন ধরেছিল পিন্ডদান করার জন্যে এসেছে কিনা? অফিসের কাজে এসেছে বলে পাশ কাটিয়ে গেছে। সঞ্জিত হোটেলের

বয় ছোকরা বিহারি ছেলেটার সঙ্গে ভাব জমাল। তারপর ওর মুখ থেকে পিন্ডদানের ব্যাপারে বেশ কিছু তথ্য জানতে পারল। বেয়ারাটাকেও বুঝতে দিল না কেননা হোটেলের সঙ্গেও পান্ডাদের যোগসাজশ থাকে।

ঘরে ঢুকে ও অর্ণবকে বলল, 'যা বুঝলাম, এখানে তিন জায়গায় পিন্ডদান করা চলে। জানি না সত্যি মিথ্যে কিনা?' বলে চেয়ারে বসল। 'তিনটে স্থান হল বিষ্ণুপাদ মন্দির, রামশিলা মন্দির আর প্রেতশিলা মানে ভূতের পাহাড়!' কথাটা শুনেই অর্ণবের গায়ে একটু কাঁটা দিয়ে উঠল।

সঞ্জিত বলে চলে, 'দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা, অল্প বয়সে মৃত্যু বা অপঘাতে মৃত্যু... মোদ্দা কথা, অতৃপ্ত আত্মার শান্তি কামনায় পিন্ডদানের মোক্ষম স্থান হল প্রেতশিলা।'

— 'এইটুকু সময়ে অনেক কথা জেনে ফেলেছ।'

— 'আরও আছে।' চেয়ারে হেলান দিল সঞ্জিত, 'একটা ছোট টিলার ওপর প্রেতশিলা অবস্থিত। প্রায় সাতশোর ওপর উঁচু-নিচু পাথরের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে পৌঁছতে হয়। সেখানে শ্মশানকালীর মন্দির আছে। পাহাড়টাই যেন পুরো শ্মশানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। নীচে একটা কবরস্থানও আছে।' অর্ণব চোখ বড় বড় করে শুনছে।

'প্রেতশিলায় একটা বড় ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ আছে। সেই গাছটাকে এখানকার অনেকেই ভয় পায়।' অর্ণব আর চুপ করে থাকতে পারল না, 'ভয় পায়? কেন কেন?' ও নিজেই ভয় পাচ্ছে। এইসব কথা কোনোদিন শোনেনি।

— 'বেয়ারাটা যা বলল ঐ গাছে নাকি অশরীরীরা থাকে। শেষে কয়েকটা কথা বলল। সারা পাহাড়ে কোনো জল পাওয়া যায় না! আর বিকেল পাঁচটার মধ্যে ওখানকার স্থানীয় মানুষ, পুরোহিত, পান্ডারা পর্যন্ত প্রেতশিলা ছেড়ে নিচে নেমে আসে। পুরো টিলাটাই তখন জনমানবশূন্য এক প্রেতপুরী!'

— 'ভাই সঞ্জিত, কারোর মাধ্যমে পিন্ডদান করে দাও। পয়সা খরচ হয় হোক। কথাগুলো শুনেই আমার সারা গা ছমছম করছে!' একটা ভয়ের হালকা প্রলেপ ওর মুখ জুড়ে খেলা করছে।

— 'আমরা নিজেরা না গেলে তোমার বোন মুক্তি পাবে কী করে? ওসব কথা ছাড়ো, এখানকার লোকরা একটু রং চড়িয়েই বলে। বরং বিকেলে চলো, ফাল্গুনী নদীটা দেখে আসি। সীতার অভিশাপে যা ফল্গু নদীতে রূপান্তরিত। নদীর জলের স্রোত বালির নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে। অন্তঃসলিলা।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সঞ্জিত, 'যাই স্নান করে নিই।'

— 'তুমি অনেক কিছু জানো। আর আমার থেকে অনেক বেশি সাহসী।' ওর কথা শুনে সঞ্জিত মনে মনে ভাবে, অপারেশনের পর থেকেই ওর সাহস তলানিতে এসে ঠেকেছে। এতদূর পর্যন্ত এসেছে শুধু নিজের তাগিদে! যাতে কাকলী পুনরায় ওর স্বপ্নে ফিরে না আসে! এবং মেয়েটাও যেন মুক্তি পেয়ে যায়!

কিন্তু ও ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি... কাকলী অনেক আগেই ওর কাছাকাছি চলে এসেছে! মুক্তির লোভে!

বিকেলে ওরা বেরোল ফল্গু নদী দেখার জন্যে। হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে জায়গাটায় কীভাবে যেতে হবে জেনে নিল। নভেম্বর মাসের প্রথম। পরশু কালীপুজো। গয়ায় ইতিমধ্যে ঠান্ডা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। দুজনে একটা করে গলা কাটা সোয়েটার পরে নিয়েছে।

নদীর রূপ দেখে ভালো লাগল। যেন ছোটখাটো মরুভূমি। দূরে এক ফালি জলের রেখা। ওরা কয়েক ধাপ নেমে এসে সিঁড়িতে বসল। বেশ কিছু স্থানীয় মানুষ বালি খুঁড়ে জল বার করছে।

অর্ণব বলল, 'সকালে এসেছি, সন্ধ্যে হতে চলল। আসল কাজের এখনও কোনো ব্যবস্থা হল না। কালীপুজোর পরদিনই আমাদের ফেরার টিকিট।' সঞ্জিতও বসে বসে এই কথাটা ভাবছিল। আসলে ওদের দু'জনের আসা-যাওয়া, হোটেল খরচা অনেক টাকাই বেরিয়ে গেছে। এখন পিন্ডদানের জন্যে যদি হাজার পাঁচেক টাকা চেয়ে বসে! বড়জোর এক হাজার খরচা করতে পারবে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যের আঁধার নামছে। নদীর ওপারে কুয়াশার জাল। ঠান্ডাটাও বাড়ছে। ওরা উঠে দাঁড়াল। দু'তিন ধাপ সিঁড়ি ওঠার পরই ওদের চোখ আটকাল একটা ছোটখাটো মানুষের জটলার দিকে। ওপরের ধাপে কাউকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু লোক। ওরাও গেল কী ঘটনা জানবার জন্যে।

তখনও ওরা জানত না কী বিপদের মধ্যে ওরা পড়তে চলেছে।

ভিড়ের মধ্যে বেশিরভাগ স্থানীয় লোক। কয়েকজন বাঙালিও আছে। ওরা পা উঁচু করে দেখল সামনে একটা ধুনি জ্বালিয়ে জটা-দাড়ি-গোঁফধারী একজন লম্বাটে রোগা মতো লোক। সারা কপালে সিঁদুরে মাখামাখি। চোখ বুজে বিড়বিড় করে দুর্বোধ্য মন্ত্র পড়ছে। খুব সম্ভবত কোনো তান্ত্রিক বা কাপালিক। কেননা জ্বলন্ত ধুনির পাশেই ছোট একটা মাথার খুলি। খুব সম্ভবত কোনো বাচ্চার হবে। ওরা লোকমুখে শুনল খুব শক্তিধর তান্ত্রিক। দিন পনের হল এখানে আসন পেতেছে। সঞ্জিতের অবাক লাগল। এখানে আসার সময় তো চোখে পড়েনি!

একজন দেহাতি লোক বলল বাবা সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এই নদীতে বালির মধ্যে সারা দেহ ঢুকিয়ে শুধু মাথাটুকু বার করে তপস্যা করেন। তারপর ভক্তরা ওঁকে বালির ভেতর থেকে বার করে এখানে নিয়ে আসে। এই সন্ধ্যে থেকে সারা রাত্রি এখানে আগুন জ্বালিয়ে বসে মন্ত্র পড়বে। কথা শুনে কয়েকজন হাত তুলে প্রণাম করছে।

অর্ণব বলল, 'বাবাজি, হাত-ফাত কুছ দেখতে হ্যায়?' ওর বাংলা মিশ্রিত হিন্দি শুনে একজন এগিয়ে এল।

'জী, আপ থোড়া দের রুক যাইয়ে। বন্দোবস্ত হো যায়গা।' এই ভয়টাই সঞ্জিত খাচ্ছিল। দুটো ষন্ডামার্কা ভক্ত অর্ণবকে নিয়ে গিয়ে বাবার সামনে বসিয়ে দিল। অগত্যা ওকেও দাঁড়িয়ে যেতে হল। বুঝল ছাড়া পেতে গেলে কিছু পকেট থেকে খসবে। বন্ধুর ওপর একটা ঠান্ডা রাগ জমে উঠল।

বাবা মন্ত্র পড়েই চলেছে। থামার নাম নেই। সঞ্জিত ঘড়ি দেখছে — প্রায় দশ মিনিট হতে চলল। ভক্তরা বুঝতে পারছে ওরা অধৈর্য্য হয়ে পড়ছে। কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে ভিড় পাতলা করে দিল। এর ফলে ওদের মন আশঙ্কায় দুলে উঠল। অর্ণব নিজের বোকামির জন্যে আফসোস করতে লাগল।

তান্ত্রিক চোখ খুলে চাইল। একটা অন্তর্ভেদী চাউনি। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'ঘোর বিপদ। তেরে সামনে ঘোর বিপদ বেটা।' কথাটা শুনে অর্ণবের মুখ শুকনো হল। এরপরের কথায় সঞ্জিতও অবাক হল, 'আয়ে হো পিন্ডদান কে লিয়ে! লেকিন, উসি মে কুছ গড়বড়ি হোগা।' ওরা ভাবছে কথাটা ইনি জানলেন কী করে? তবে কি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লেন? এবার বাবা সঞ্জিতের দিকে তাকিয়ে বলল। 'প্যায়সে কে লিয়ে ফিকর মত করো। এক প্যায়সা ভি নেহি লাগেগা। শুভ দিন মে আয়ে হো। সব ঠিক কর দেঙ্গে।' বলে পুনরায় চোখ বুজে ফেললেন।

দু'জন বাহুবলি ভক্ত ওদের বলল, 'বাবার কৃপা পেয়ে গেলেন। আমরাই সব কিছু করে দেব। চলুন হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

ওদের মনে হচ্ছে অনুরোধের আড়ালে নির্দেশ দিচ্ছে। ওরা হোটেল পর্যন্ত এল। যাবার সময় বলে গেল আর কারোর সঙ্গে কথা না বলতে। যা করবার তারাই করে দেবে। গুরুদেব ঠিক ঐ আত্মাকে শান্তি দেবেন।

হোটেলের ঘরে ঢুকে সঞ্জিতের রাগ ফেটে পড়ল, 'তোমার জন্যেই ওদের খপ্পরে পড়লাম। জানি না এদের জাল কেটে বেরোতে পারব কি না।'

অর্ণব একটু চুপ থেকে বলল, 'মানছি। কিন্তু টাকাপয়সা লাগবে না কিছু।'

— 'তুমি ঐ কথা বিশ্বাস করেছ নাকি?' বুঝল ও একটু সরল প্রকৃতির। রাত্রে খেয়েদেয়ে একরাশ মাথায় ভাবনা নিয়ে শুল সঞ্জিত। চোখ বুজে ভেবে চলল — কালকেই যদি প্রেত শিলাতে পিন্ড দিয়ে চলে আসা যায়, তাহলে এদের বলা যাবে কাজ মিটে গেছে। অর্ণবকে বলতে গিয়ে দেখল অর্ণব ঘুমিয়ে গেছে।

সন্ধ্যে থেকে পিন্ডদান, তান্ত্রিক, এইসব কথা ক্রমাগত চিন্তার ফলে বোধহয় সঞ্জিতের স্বপ্নেও তার প্রতিফলন ঘটল। কেননা অনেকদিন পর কাকলীর রক্তশূন্য সাদা মুখটা ভেসে উঠল। বিস্ময়ে দেখল ওর

ভয়ার্ত মুখ! বুঝতে পারছে না কাকলী এত ভীত কেন? তবে কি অদৃশ্য জগতে এখনও একাই বিচরণ করছে? তারপরেই স্বপ্নের পরিবর্তন ঘটল। দেখছে একটা উঁচু টিলা থেকে ওরা দু'জন হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি ভেঙে নামছে। আর পিছনে কয়েকটা কালো হাত বাতাসের মত তাড়া করে আসছে!

ভয়ে ওর ঘুমটা ভেঙে গেল। অপারেশনের সময়ে যে রকম ভয়ের অনুভূতি শরীরে লাগত সেইরকম অনুভূতি সারা দেহে ফিরে এসেছে। একটু জল খেয়ে বাথরুমে গেল। বাথরুমের দরজাটা খুলতেই ভূত দেখল। শাওয়ারের কাছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কাকলীর অর্ধেক শরীরটা ভাসছে! নিজেকে সামলাতে পারল না। গলা চিরে একটা চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল।আর তাতেই অর্ণবের ঘুমটা ভেঙে গেল।

ও দৌড়ে এসে সঞ্জিতকে ধরে ফেলল। মুখটা দেখেই সঞ্জিত বুঝে ফেলল প্রচন্ড ভয় পেয়েছে। ওকে অর্ণব বিছানায় বসিয়ে বলল, 'কী হয়েছে? কী দেখে ভয় পেয়েছ?'

সঞ্জিত নিজেকে সামলাল। অহেতুক অর্ণবকে ভয় পাইয়ে লাভ নেই। হিতে বিপরীত হতে পারে। কাকলীর বিদেহী আত্মা তাহলে এখনও ওদের সঙ্গেই আছে! সঞ্জিতের বুকটা একটু কাঁপল।

— 'বোধহয় স্বপ্নের ঘোর কাটেনি। তাই চোখে ভুল দেখেছি।' কথা ঘোরাল ও। 'ভালো কথা, কালকেই আমরা বোনের পিন্ডদানের জন্যে বেরিয়ে পড়ব।'

— 'ওরা যদি এসে কিছু বলে?'

— 'আমার ওপর ছেড়ে দাও। মুখ আর খুলবে না।'

— 'পাগল... আর ভুল করি?'

রাত দুটো বাজে। সঞ্জিত জানে চেষ্টা করেও ঘুম আনতে পারবে না। কেননা চোখ বুজলেই ও দেখা দেবে। কিন্তু কেন? ও কি বুঝতে পারছে না... ওর শান্তির জন্যেই এতদূর ছুটে আসা? যাক, আর আজকের রাতটুকু কষ্ট করো কাকলী। কালকেই তোমার মুক্তি!

আমরা ভাবি এক, হয় আর এক। সেটা দু'জনে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিল সকালে।

সকালেই ব্রেকফাস্ট সেরে ওরা বেরোল। যাবার সময় কাকলীর বাঁধানো ছবিটা হাতব্যাগে পুরে নিল। এক বোতল জল নিল, কেননা শুনেছে পাহাড়ে জল পাওয়া যায় না। এরপর যা যা লাগবে ওখানকার দোকান থেকেই কিনে নেবে। ওখান থেকেই দরদাম করে পান্ডা নিয়ে নেবে। যেমন করে হোক এই তান্ত্রিকের খপ্পর থেকে বেরোতে হবে।

কিন্তু প্রেত শিলার কাছে এসে দুজনেই স্থবির হয়ে গেল। তান্ত্রিক বাবার দুই ভক্ত সামনেই দাঁড়িয়ে। একজন বলে উঠল, 'আপ লোগ ইঁয়াহা?' অর্ণব কিছু বলার আগেই সঞ্জিত বলে উঠল, 'ঘুমনে আয়া।'

আর এক ভক্ত ব্যাগটার দিকে চেয়ে যা বলল তার সারমর্ম হল এটা বেড়াবার জায়গা নয়। অতৃপ্ত আত্মারা এখানে সারাক্ষণ হাঁ করে আর হাত পেতে থাকে এক ফোঁটা জলের জন্যে! তার মধ্যে অনেক দুষ্ট আত্মারাও থাকে অনিষ্ট করার জন্যে। এখানে সময় নষ্ট না করে ফিরে যাও। সন্ধ্যের মধ্যে আমরা তোমাদের হোটেলে গিয়ে নিয়ে আসব। কেননা আজকে বাবা বিশেষ পুজোয় বসবে তোমাদের জন্য।

এত কথা শোনার পর আর এগোনো যায় না। টিলাটার দিকে তাকিয়ে সঞ্জিতের রাত্রের দুঃস্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল। হুবহু এই পাহাড়টাকেই সে দেখেছে! কী করে সম্ভব হল? এর আগে সঞ্জিত কোনোদিন এখানে আসেনি! ফেরার রাস্তা ধরল। সঞ্জিত বলল, 'মন বলছে, এরা আমাদের নিয়ে অন্য কিছু করতে চাইছে। নাহলে আমাদের সারাক্ষণ নজরে রাখত না!'

— 'ঠিকই বলেছ। পিন্ডি-ফিন্ডি না দিয়ে চল আজকেই কেটে পড়ি।'

সঞ্জিত নিজেও তাই চায়। কিন্তু কাকলীর মুখটা ভাসছে মনে। এতটা পথ এসে আসল কাজ না সেরেই ফিরে যাবে?

— 'কী ভাবছ?'

— 'যেমন করেই হোক পিন্ডর কাজটা সারতে হবে।'

অর্ণব অধৈর্য্য হয়, ‘ওদের চোখকে ফাঁকি দেবে কী করে? এদিকে হাতে বেশি সময় নেই।’

সঞ্জিত কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, ‘কাকলীই আমাদের রাস্তা দেখাবে!’ বুঝল বেফাঁস কথাটা বেরোল। বন্ধুর চোখ দুটো বড়বড় হল।

সঞ্জিত পরক্ষণেই কথা ঘোরাল, ‘আমি বলতে চাইছি ও নিজেও মুক্তির জন্যে দিন গুনছে। এবার চলো, রৌদ্রের তেজ বাড়ছে।’ চারিদিকে একটা রুক্ষ হাওয়া হু হু করে বইছে।

অনেকেই আসছে প্রিয়জনের পিন্ডদানের উদ্দেশ্যে। অনেকের হাতে ছবি। না জেনে ছবিটা এনে ভালোই করেছে। ওরা ফিরে চলল বিকালের কথা চিন্তা করতে করতে। কিন্তু হোটেলে ঢোকার আগে সঞ্জিত অর্ণবকে নিয়ে চলল বাজারের পথে। ও বুঝতে পারছে না সে কি করতে চাইছে। ভাবল প্রশ্ন করে। কিন্তু সঞ্জিতের কঠিন মুখ ও শক্ত চোয়াল দেখে চুপ করে রইল। এই বিরাট ঝামেলায় পড়ার জন্যে একেই সে দায়ী!

কিন্তু যে জিনিসপত্র বন্ধু কিনছে... এরপর না প্রশ্ন করে থাকতে পারল না।

বাজারের একটা দশকর্মার দোকান থেকে পিন্ডদানের জন্যে যা যা লাগবে সব কিনল সঞ্জিত। এরপর ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে গেল। এক গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলল বিকেল পাঁচটার মধ্যে প্রেত শিলায় পৌঁছে দেবে কত নেবে? ড্রাইভারটা অবাক হয়ে গেল। বলল, ‘ইস সময় কাহে উধার যায়েগা?’ সঞ্জিত বুদ্ধি করে বলল, ‘একদম ভোরে পিন্ডদান করব। কাল কালীপুজো খুব ভিড় হবে। তাছাড়া কালকেই আমাদের কলকাতায় ফিরতে হবে। রাতটা নিচে কোনো জায়গায় কাটিয়ে দেব।’ ড্রাইভার বলল চারটের মধ্যে স্ট্যান্ডে চলে আসতে। সঞ্জিত কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে ওর ফোন নম্বরটা নিল। অর্ণব আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, ‘তুমি কী করতে চাইছ বলবে?’

‘আমরা আজ রাতেই প্রেত শিলায় চড়ব। পাঁজিতে মন্ত্র লেখা আছে। পাঁজি অনুযায়ী সব কিনেছি। ওরা কল্পনাই করতে পারবে না যে রাত্রে আমরা ভূতের পাহাড়ে থাকব। এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। ওদের ফাঁকিও দেওয়া যাবে তার সঙ্গে কাকলীর পিন্ডদান হয়ে যাবে। কথাটা অর্ণবের মনে ধরল। কিন্তু সন্ধ্যের সময় প্রেত শিলায় ওঠা? সঞ্জিতকে কথাটা বললেই রেগে যাবে বলে চুপ করে রইল। কেননা ওর জন্যই এইরকম ঝামেলায় পড়ে গেছে ওরা।

হোটেলের রিসেপশনের সামনে কয়েকজনের সঙ্গে উত্তেজিত ভাবে কথা বলতে ম্যানেজারকে দেখল ওরা। কৌতূহলবশত এগিয়ে গেল। যা শুনল তাতে মন-মাথা হালকা হয়ে গেল। একটু আগেই পুলিশ এসে দলবল সমেত তান্ত্রিককে থানায় ধরে নিয়ে গেছে কয়েকদিন আগে পাশের গ্রামে এক দম্পতির এফআইআরের ভিত্তিতে। ওদের ছোট মেয়েটাকে অসুখ সারাবার নাম করে এক রাত তান্ত্রিকের ডেরায় রাখে। তারপর দিন থেকে তান্ত্রিক ফেরার। ছোট মুন্ডুটার সাথে বাবাকে লক আপে পুরেছে। ওঃ, ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল ওদের।

রুমে এসে অর্ণব বলল, ‘তাহলে আর অসময়ে ঐ ভূতের পাহাড়ে গিয়ে লাভ নেই।’

‘বরং দেরী না করে আজই যাওয়া উচিত। কেননা তোমার বোন তার কাজ করে দিয়েছে। এবার আমাদের পালা। বলেছিলাম না! কাকলী একটা রাস্তা দেখাবে।’

এরপর আর কিছু বলা যায় না। যতই হোক তার বোনের আত্মার শান্তির জন্যে করছে। তাছাড়া গাড়িকেও অ্যাডভান্স দেওয়া হয়ে গেছে।

তান্ত্রিকের ঝামেলা কেটে যাওয়াতে অর্ণবের মনেও একটা জোর এসে গেছে। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিরামিষ খাবারের অর্ডার দিল। যতই হোক মাছ-মাংস খেয়ে পিন্ড দিতে যাবে না। ওদের পরিণত বয়স, পরিণত মস্তিস্ক হলে এরকম হঠকারী সিদ্ধান্ত নিত না। সব কিছুরই দিনক্ষণ আছে। তাছাড়া পুরোহিত বা পান্ডারা হল একটা মাধ্যম। যুগ যুগ ধরে এই নিয়ম চলে আসছে। যৌবনের রক্তে বলীয়ান হয়ে তার ব্যতিক্রম ঘটানো সব সময় ঠিক নয়।

সাড়ে তিনটে নাগাদ যখন ওরা হোটেল ছাড়ল ম্যানেজারকে জানিয়ে গেল অফিসের কাজে বেরোচ্ছে, রাত্রে ফিরবে না। কাল সকালের দিকে আসবে। ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে ওদের গাড়ি যখন ছাড়ল বিকেল চারটে বেজে গেছে।

সূর্যের তেজ ক্রমশ কমে আসছে। ঘিঞ্জি রাস্তা ছাড়িয়ে গাড়ি ফাঁকা রাস্তা ধরল। আগামীকাল কালীপুজো। শ্মশানকালীর মন্দিরেও পুজো হবে। ভক্তরাও নিশ্চয়ই ভোরের আলো ফোটার আগেই চলে আসবে।

ড্রাইভারটা ওদের বলল, 'আপনারা কমবয়সী, অ্যাডভেঞ্চার ভেবে যেন রাতের অন্ধকারেই সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠবেন না!' ওরা অভয় দিল। পাঁচটা দশ নাগাদ ওদের নামিয়ে দিয়ে ভাড়া নিয়ে ট্যাক্সি দ্রুত গতিতে ফিরে গেল। মনে হল পালিয়ে বাঁচল।

সকালে যখন এসেছিল এখানে তখন কত লোকজন! আর এখন? পুরো শ্মশান। ওরা পায়ে পায়ে টিলাটার নিচে পৌঁছল যেখান থেকে পাথরের সিঁড়ি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে সূর্য অস্ত গেছে। শেষ আলোর রশ্মিটুকু পশ্চিম আকাশে এক চিলতে লেগে রয়েছে। ওরা সেই স্বল্প আলোতে পাহাড়ের উঁচু দিকটার দিকে তাকাল।

বড় বড় গাছগুলো থেকে দল বেঁধে পাখি আর কাকেরা ডাকতে ডাকতে সমতলভূমির দিকে নেমে আসছে। মনে হচ্ছে ওরাও ঐ স্থান ছেড়ে পালাচ্ছে! একটা দুটো দোকান খোলা ছিল। সেগুলোরও ঝাঁপ বন্ধ হচ্ছে। সামনাসামনি আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। শেষ দোকানী যাবার সময় ওদের দেখে বলল, 'হেই বাঙালী বাবু, আপ লোগ ইস সময় ইধার?'

সঞ্জিত হেসে বলল, 'কাল ভোরেই পিন্ডদান করে কলকাতায় ফিরব।'

— 'রাত ভর এহি রহেঙ্গে ক্যা?' দোকানির বিস্ময়ের গলা।

অর্ণব এবার বলল, 'ডর কা কুছ বাত হ্যায় কেয়া?'

লোকটা কিছু একটা বলতে গিয়েও ঢোঁক গিলে নিল। পাহাড়ের উঁচু দিকটায় তাকিয়ে চোখটা নামিয়ে বড় বড় পা ফেলে লোক বসতির দিকে হাঁটা দিল। চারিদিকে ক্রমশ আঁধার ছাইছে। তার সঙ্গে ঠান্ডাটাও বাড়ছে। ওরা ব্যাগ থেকে ফুল হাতা সোয়েটার বার করে গায়ে চড়াল।

সঞ্জিত হাতে হাত ঘষে বলল, 'এসো, এই বন্ধ দোকানটার সামনে বসে একটু ধূমপান করি। একটু রাত হোক, তারপর প্রেত শিলায় উঠব। নাহলে আবার কেউ দেখে বাধা দেবে।'

অর্ণবের মনে একটা অজানা ভয় খেলা করতে শুরু করেছে! চারিদিকের পরিবেশ এর জন্যে অনেকটা দায়ী।

প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে দুজনেই নীরব প্রতীক্ষায় কাটাল। এর মধ্যে একটাও কথা হয়নি। যেন সব কথা হারিয়ে গেছে। আসলে দুজনেই ভাবনার সাগরে ডুবে আছে। সঞ্জিত ব্যাগ থেকে টর্চটা বার করল। ঘড়িতে নটা বাজছে।

'চলো এবারে যাত্রা শুরু করি।'

সঞ্জিতের কথা শুনে অর্ণবের মনে হল শেষ যাত্রা নয় তো? অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিঁড়ির দিকে এগোল। সিঁড়ির প্রথম ধাপটার কাছে এসে আলো ফেলে দেখল ওপরের দিকে পাঁচ-ছয় ধাপ পর্যন্ত আলোর রেখা যাচ্ছে। তারপর ঘুটঘুটে অন্ধকার! এঁকেবেঁকে সিঁড়িটা বোধহয় নরকের শেষ প্রান্তে উঠে গেছে।

অর্ণব আরও একবার বলার চেষ্টা করল — ভোরেই না হয় ওঠা যাবে। ততক্ষণে সঞ্জিত টর্চের আলোয় দুটো ধাপ উঠে গেছে। বাধ্য হয়ে ওর সঙ্গ নিতে হল। বেশ খানিকটা একনাগাড়ে উঠে অর্ণব হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এবার একটু দাঁড়াও জিরিয়ে নিই।'

বাধ্য হয়ে সঞ্জিত দাঁড়াল। দূরে নিচে লোকালয়ের আলোগুলো জোনাকির মতো জ্বলছে। সিঁড়ির দু'পাশে শুধু পাথুরে জমি, আর জঙ্গলের মধ্যে বড় বড় গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, নিঃঝুম। সারা ধরিত্রী যেন কিসের আগমনের প্রতীক্ষায় অপেক্ষারত! আবহাওয়ায় শীতলতার পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। এতক্ষণ সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল বলে ঠান্ডার পরিমাণটা বুঝতে পারেনি। এখন মালুম পাচ্ছে।

অর্ণব শুকনো ঠোঁটটা চেটে বলল, 'মনে হয় আমরা গোঁয়ার্তুমি করছি। শুধু ঐ শুকনো আতপ চাল, তিল, কলা দিয়ে পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলেই পিন্ডদান হয়ে যাবে? মন্ত্র-তন্ত্র লাগবে না?'

— 'এর আগেও বলেছি। চিন্তা কোরো না। পাঁজি নিয়ে এসেছি। দানে যা যা লাগবে সবই এনেছি। মন্ত্রটাও পাঁজিতে আছে।' ও চুপ করে গেল।

হঠাৎ একটা শোঁ শোঁ করে হাওয়া উঠল। মনে হল এক খন্ড বরফ ওদের গায়ে কেউ বুলিয়ে দিয়ে গেল।

'আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই,' সঞ্জিতের ব্যস্ত কণ্ঠ।

— 'সবে আশিটা সিঁড়ি উঠেছি। এখনও ছশো কুড়ি বাকি।' ও কি সিঁড়িও গুনছে নাকি? ছশো সিঁড়ি শুনে আরও যেন হাঁফিয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে বন্ধু তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে।

— 'আরে একসঙ্গে চলো, অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না...' বলতে বলতেই অর্ণব হোঁচট খেল। পাথরের সিঁড়িতে মুখটা আর একটু হলেই ঠুকে যেত। সঞ্জিত তাড়াতাড়ি দু ধাপ নেমে এল।

'হোঁচট খেলে কী করে?' উদ্বিগ্ন গলা।

— 'কিসে পা লাগল!' টর্চ ফেলতেই দুজনের চোখেই আতঙ্ক দেখা দিল। কনুই থেকে একটা কালো শুকনো কাটা হাত। সিঁড়ির কোণে পড়ে আছে! অর্ণবের শরীরে হিস্টিরিয়া রোগীর ছোঁয়া লাগল। বেতসপাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে মুখ দিয়ে একটা শব্দই বেরিয়ে চলল — 'ভূ...ভূ... ভূত!'

বিপদের ঘন্টি অবজ্ঞা করেও যদি কেউ জেদ বজায় রাখতে চায় তার অবস্থা যে কতখানি শোচনীয় হয়? কিছুক্ষণের মধ্যে সঞ্জিত বুঝতে পেরেছিল।

সঞ্জিতও বেশ ভয় পেয়ে গেছে। একটু আগেও এই সিঁড়ি দিয়ে কত লোকজন ওপরে উঠেছে... কারোর চোখে পড়েনি? তার মানে তখন কাটা হাতটা এখানে ছিল না। মনটাকে শক্ত করে হাতটার ওপর আলো ফেলতেই নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। ঐ আকৃতির একটা শুকনো গাছের ডাল।

অর্ণব অনেকটা সুস্থ হল, 'একটু জল দাও।'

সঞ্জিত বোতল বার করে বলল, 'বেশি খেও না। মাত্র দু'বোতল জল এনেছি। জানোই তো এই অঞ্চলে জলের বড় অভাব। হাঁ করো মুখে ঢেলে দিচ্ছি।' ও হাঁ করতেই চারিদিকে একটা চামড়া পচার বিকট গন্ধে জায়গাটা ভরে উঠল। মনে হল অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত গলা দিয়ে উঠে আসবে!

সঞ্জিতের কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বলে উঠল, 'শীগগির জলের বোতল ব্যাগে ঢোকাও। কত শত বছর ধরে কত অতৃপ্ত আত্মারা এক ফোঁটা জলের জন্যে হাহাকার করছে। আর তুমি ওদের সামনে জলের লোভ দেখাচ্ছ?' এ তো সেই স্বপ্নের কাকলীর গলা! ও চমকে উঠে অন্ধকারটার দিকে তাকাল। কেউ কোত্থাও নেই। কিন্তু কথাগুলো মাথার মধ্যে গিয়ে হাত-পা অবশ করে দিল। কথাগুলোর মধ্যে সত্যতা আছে। জল পান করার লোভে বিদেহী শরীরগুলো নিশ্চয়ই কাছাকাছি চলে এসেছে!

বন্ধুর মুখে টর্চটা ধরে অর্ণব বলল, 'কী হল, জল দাও!' ওর মনে হল কোনো অশরীরী জল চাইছে! বোতলটা চটপট ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে কাঁপা গলায় বলল, 'আর খেতে হবে না। বরং তাড়াতাড়ি পা চালাও।' আবার শুরু হল সিঁড়ি ভাঙা। ওদের জুতোর শব্দে ওরা বারবার চমকে উঠছে। মনে হচ্ছে সিঁড়ি বেয়ে নরকের দরজায় পৌছচ্ছে। কত রাত হল কে জানে? আকাশে অসংখ্য তারার মেলা। অমাবস্যার রাত্রি বলে অন্ধকারটা বেশি জমাট।

খানিকটা সময় ধরে একনাগাড়ে উঠছে। দু'জনের কোমরেই বেশ ব্যথা করছে। যতই জোয়ান হোক, এই পাথুরে সিঁড়ি চড়ার অভ্যেস নেই। এই ঠান্ডাতেও ঘেমে গেছে। সঞ্জিতেরও মনে হচ্ছে একটু দাঁড়ানো দরকার। প্রায় দুশো সিঁড়ি উঠে এসেছে। বুকটা তেষ্টায় ফেটে যাচ্ছে। অর্ণবের অবস্থাও একই রকম। কিন্তু জলের নাম মনে আসতেই সিঁটিয়ে উঠল। ইচ্ছেটাকে দমন করল।

এই সময় ওদের কানে বাচ্চা ছেলের কান্না ভেসে এল। অর্ণব ভয়চকিত গলায় বলল, 'নিচে কবরখানা থেকে কোনো মরা বাচ্চা কাঁদছে।'

সঞ্জিত ভালো করে শুনে বলল, 'শকুনের বাচ্চা।'

অন্ধকারে টর্চের আলো বন্ধ করতেও ভয় লাগছে! কিন্তু টর্চটা সেই থেকে একটানা জ্বলছে। ব্যাটারী যদি ফুরিয়ে যায়? কথাটা মনে আসা মাত্রই সঞ্জিতের মনের কোটরে লুকিয়ে থাকা ভয়টা শক্তি বাড়াতে শুরু করল। মাত্র দুশো সিঁড়ি ভেঙেই কাহিল হয়ে পড়েছে। এখন মনে হচ্ছে গোঁয়ার্তুমিটা না করলেই ভালো ছিল! ঘড়িতে সবে সাড়ে বারোটা বাজে।

অর্ণব মনে হয় খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মিনমিনে স্বরে বলল, 'আর পারছি না। একটু জল দেবে?'

— 'তুমি বায়না-টায়নাগুলো একটু কম করো।' জলের নাম শুনে সঞ্জিত কর্কশ গলায় বলল, 'তুমি তো তবু একবার জল খেয়েছ, আর আমি?'

— 'যাহ বাবা, তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন? তুমিও খাও না!'

সঞ্জিত আসল কথাটা না পারছে বলতে, না পারছে গিলতে। সেইজন্যে ভয়, রাগ মিশে মাথাটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

— 'চলো চলো আরও একটু এগিয়ে জল খাওয়া যাবে...'

পুনরায় শুরু হল সিঁড়ি বেয়ে ওঠা। প্রায় মিনিট পাঁচেক ওঠার পর সঞ্জিত হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল।

মনে হচ্ছে হাতের ব্যাগটা কেউ পিছু থেকে টানছে! আতঙ্কের নাগপাশ ওর মনটাকে গিলতে শুরু করল। আতঙ্কে গায়ের রোমকূপগুলো খাড়া হয়ে গেল। ওকে দাঁড়াতে দেখে অর্ণব টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে গেল। সঞ্জিতকে দেখে মনে হচ্ছে সারা শরীরে প্রাণ নেই। অর্ণব কাছে এসে বলল, 'তখনই বললাম একটু জল খাও।' উত্তর দেবার ক্ষমতাটুকুও ও হারিয়ে ফেলেছে। কেননা ব্যাগটা এখনও কেউ ধরে রেখেছে। টেনেও ছাড়াতে পারছে না। পিছনে ফিরেও কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ব্যাগের ভেতরে রাখা পিন্ডের যাবতীয় জিনিস আর জলটুকু কেউ ছিনিয়ে নিতে চাইছে!

বন্ধুর মুখের চেহারা দেখে অর্ণবের বুকটাও কেঁপে উঠল। সঞ্জিত যে প্রচন্ড ভয় পেয়েছে সেটা অর্ণব বুঝতে পারছে। কিন্তু কেন ভয় পেয়েছে সেটাই মাথায় ঢুকছে না। পাশেই সেই ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটা। লোকে বলে এটাতে নাকি অশরীরীদের বাস। কোনোরকমে কয়েকটা কথা উচ্চারণ করে সঞ্জিত, 'এই ব্যাগটা এক… একটু ধ... ধরবে?'

অর্ণব ব্যাগটা হাতে নিতে গিয়ে বলে, 'কই ব্যাগটা ছাড়ো?'

সঞ্জিত ব্যাগটা আগেই ছেড়ে দিয়েছে। টর্চের আলোতে দেখল ব্যাগটা শূন্যে ঝুলছে! আর অন্যদিক ধরে অর্ণব টানাটানি করছে।

সঞ্জিত এই প্রথম আর্তনাদ করে উঠল, 'ছেড়ে দাও। ব্যাগটা ছেড়ে দাও।'

বন্ধুর চিৎকারে অর্ণব ব্যাগটা ছাড়তেই ব্যাগটা সিঁড়িতে ধপাস করে পড়ল।

দুজনেই ভয়ের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেল। কেননা দুজনেই এইমাত্র উপলব্ধি করেছে বিদেহী অতৃপ্ত আত্মাদের উপস্থিতি। ওরা বুঝতে পারছে না এরপরে কী হতে চলেছে? এবং সেই নারকীয় কান্ড প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এই মুহূর্তে ওদের শরীরে কতটুকু অবশিষ্ট আছে?

পায়ের কাছে পড়ে থাকা ব্যাগটা দুজনেই বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখছে। সঞ্জিত দাঁতে দাঁত চেপে নিচু হয়ে ব্যাগটা তুলল। কেননা ওর মধ্যে কাকলীর ছবিটাও আছে। অর্ণবের হাতের টর্চটা একটু দপদপ করে উঠল। যা ভেবেছিল তাই ঘটতে চলেছে। টর্চের ব্যাটারি দেহ রাখতে চলেছে। তার মানে একটু বাদেই অমাবস্যার কালো অন্ধকার ওদের গ্রাস করতে চলেছে।

কাকলীর একটা কথা সঞ্জিতের মনে হঠাৎ উদয় হল… এখানে এই আঁধারে আমি একা। বড় একা। এবার থেকে আমরা দুজন একসঙ্গে এই অন্ধকার জগতে থাকব। স্বপ্নের সেই কথাগুলো ওর দেহ মনকে নাড়িয়ে দিল। তাহলে কি কাকলীর গোপন ইচ্ছে সার্থক হতে চলেছে? নাহলে কীসের আকর্ষণে সঞ্জিত এখানে

এসেছে? এত বারণ, নিষেধ শোনার পরও গভীর রাত্রে এই পথের যাত্রী হল কেন? চোখের সামনে এতগুলো ঘটনা ঘটে যাবার পরও কি মোক্ষলাভের আশায় এখনো দাঁড়িয়ে আছে?

বিপদের সংকেত কি বুঝতে পারছে না? তার সঙ্গে অর্ণবকেও বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে না? এইটুকু সোজা কথা মাথায় ঢুকছে না কেন যে টর্চের দুটো ব্যাটারি একনাগাড়ে সারারাত আলো বিকিরণ করতে পারে না। তারপর? আলোর শেষ রশ্মিটুকু হারিয়ে যাবার পর ঘুটঘুটে কালো অন্ধকারে অন্ধের মতো তারা কী করবে? কোন শক্তি দিয়ে অন্ধকারকে জয় করবে?

কাকলীর বিদেহী আত্মা পারবে তাদের পুনরায় আলোর জগতে ফিরিয়ে দিতে? প্রশ্নের পর প্রশ্ন ওর মস্তিষ্কে আছড়ে পড়ছে। যার ফলে ওদের এগিয়ে যাওয়া ক্রমশ শিথিল হচ্ছে।

এবার দুজনে দাঁড়াতে বাধ্য হল। কেননা কয়েক ধাপ সিঁড়ির ওপরে চার-পাঁচটা কুয়াশার ডেলার মতো কী পড়ে আছে! সঞ্জিত আলোটা কুয়াশার মন্ডগুলোর ওপর ফেলল। এইরকম আশ্চর্য কুয়াশা জীবনে দেখেনি। আকাশ এদিকে পরিষ্কার। একেকটা ফোলানো বড় বেলুনের মতো কুয়াশার আকৃতি! সঞ্জিত এক ধাপ উঠল ভালো করে দেখার জন্যে।

দুজনেই পরিষ্কার দেখতে পেল কুয়াশার ডেলাগুলো স্থির নয়! থিরথির করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে ওগুলো জীবন্ত! টর্চের আলোয় মনে হচ্ছে একেকটা হাত-পা বিহীন মানুষের অবয়ব! মুখের কাছটা অল্প কালচে — যেন ছোট ছোট হাঁ করে আছে। ধীরে ধীরে ওপরের ধাপগুলোতে ওদের সংখ্যা বাড়ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওপরের সব ধাপগুলো অজস্র কুয়াশাপুতুলে ভরে গেল।

সঞ্জিত আর অর্ণবের মস্তিষ্কে একসাথে বিপদের সংকেত বাজতে শুরু হয়েছে। কেননা ওরা বুঝতে পারছে, আর ওপরে যাওয়া সম্ভব নয়! ওগুলো যে অতৃপ্ত আত্মার দল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কুয়াশার মূর্তিগুলো এবার এক ধাপ করে নেমে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। তার সঙ্গে হাওয়ায় ভেসে আসছে পচা, বাসি, মাংস পোড়ার গন্ধ। আর একটা সিঁড়ি নামলেই ওরা ওদের ছুঁয়ে ফেলবে।

সঞ্জিত ব্যাগটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। দুজনের চোখেই পালাবার শপথ। সঞ্জিত কোনোও রকমে উচ্চারণ করল, 'শিগগির নিচে নেমে চলো।'

পা দুটো যেন অপেক্ষা করছিল নির্দেশ শোনার জন্যে। পড়ি কি মরি করে দুটো তিনটে ধাপ টপকে টপকে ওরা নামতে লাগল। বিদ্যুৎবেগে নামছে ওরা প্রাণের ভয়ে! পিঠের কাছেই শুনতে পাচ্ছে কান্না, হাসি, রাগ মেশানো অশরীরীদের গর্জন।

ওদের মনে একটাই প্রশ্ন পারবে কি নিচের মাটিতে পা রাখতে? এদের স্পর্শ এড়িয়ে? একেবারে সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে আর পারল না শরীরের ভারসাম্য রাখতে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। চোখ দুটোতে কালো অন্ধকার নেমে এল। জ্ঞান হারাল ওরা।

কোলাহলের শব্দে ওরা যেন ঘুম থেকে উঠল। ওদের ঘিরে একটা মানুষের জটলা। সঞ্জিত মনে মনে ঠিক করে নিল কী বলবে। তারপর বলল ভোর রাত্রে তারা এসেছে পিন্ডদানের জন্যে। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে তাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল ঐ সন্ধ্যের দোকানিটা আশেপাশে আছে কিনা? ভাগ্যিস হাত-পা কেটে ছড়ে যায়নি তাই রক্ষে!

এরপর একজন পুরোহিত নিয়ে ওরা প্রেত শিলায় উঠল। রাতের ঘটনাটা তখনও চোখের সামনে ভাসছে! ভালোভাবে পিন্ডদান সম্পন্ন হল। ওরা যখন নেমে আসছে ওদের চোখে পড়ল পাহাড়ের ঢালু বেয়ে কাকলীর অস্পষ্ট শরীরটা এগিয়ে চলেছে জঙ্গলের দিকে। একবার মুখ ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকাল। দেখল সেই মুখে একটা তৃপ্তির ছাপ। একটু বাদেই ধোঁয়ার শরীরটা মিলিয়ে গেল চিরতরের জন্যে।



গাছের প্রতিশোধ

ইভেন্টে গল্প দেওয়ার জন্যে অনুরোধ ছিল। বিষয়, গাছের প্রতিশোধ। শিরোনামটা দেখেই আমার মনে ত্রিশ বছর আগেকার স্মৃতি পুনরায় ফিরে এল। যা আমি ডাক্তার ও ওষুধের সাহায্যে ভুলতে বসেছিলাম। তবে কি ঐ রকম ভয়ঙ্কর ঘটনা মন থেকে ভুলতে দেবে না? ছলে বলে মনে করিয়ে দেবে!

এক নিমেষের মধ্যে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল সেই বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামে। যদিও এখন ঐ এলাকা ঝাড়খন্ড হিসেবেই পরিচিত। চারিদিকে টিলায় ঘেরা সবুজ পাহাড়ি গ্রাম — পাহাড়পুর। বেশ কয়েক ঘর মানুষের বাস সেখানে। থাকার মধ্যে আছে একটা পোস্ট অফিস, গ্রামীণ ব্যাংক, ছোট সরকারি ওষুধ-না-থাকা একটা চিকিৎসা কেন্দ্র আর কয়েক সারি দোকানঘর।

ওখানকার স্থানীয় লোকদের রুটি রোজগার বলতে একটু দূরে অবস্থিত স্টোন চিপের কারখানা। আর বাকিরা পেট চালায় দূরে পাহাড় বা টিলা থেকে গাছ কেটে এনে বাজারে জ্বালানি বেচে।

দূরে ঐ যে পাহাড় কেটে স্টোন চিপ বানানোর কারখানা — সেখানে চলেছে দিনরাত বিরাট বিরাট যন্ত্রের সাহায্যে কুচি পাথর তৈরী। এলাকা জুড়ে শুধু কান ফাটা ডিনামাইটের পাহাড় ফাটানোর আওয়াজ আর বড় বড় যন্ত্রের যান্ত্রিক শব্দ! চারিদিকে শুধু সাদা পাথরের ধুলো।

তবে পাহাড়পুরে থাকলে কিছুই বোঝা যায় না। কেননা সবুজ গাছে ভরা টিলাগুলো যেন পাহাড়পুরকে বুকে করে আগলে রেখেছে। আমি গিয়েছিলাম ছয় মাসের চুক্তিতে ঐ পাথর কোম্পানির সুপারভাইজার হিসেবে। কোম্পানি সামনেই কোয়ার্টার দিয়েছিল। দু'দিনেই বুঝে গিয়েছিলাম এখানে থাকলে নির্ঘাত কালা হয়ে যাব।

ওখানকারই এক কর্মী দিবাকর আমার অসুবিধেটা বুঝতে পারল। ও এগিয়ে এল।

'আপনি যদি ইচ্ছে করেন, এই কয়েক মাস আমাদের বাড়িতে থাকতে পারেন। পাশেই পাহাড়পুরে বাড়ি। ওখানে এইসব শব্দ-ধোঁয়ার থেকে মুক্তি পাবেন।'

ওর প্রস্তাবটা লুফে নিলাম। ও থাকা-খাওয়ার জন্যে টাকা নিতে রাজি হচ্ছিল না। আমি বললাম, 'তাহলে যেতে পারব না। এখানে থাকতে গেলেও খরচ আছে।'

যতই বলি, সে কিছুতেই রাজি হয় না। আসলে তখনও মানুষের মনোবৃত্তি এত ব্যবসায়িক হয়নি। তাছাড়া ও আমার অধস্তন কর্মচারী। তবুও অনেক বলার পর রাজি হল।

পরের দিনই বাইকে চড়ে সুটকেস নিয়ে ওর বাড়ি গেলাম। বাড়িতে ওর বুড়ো বাবা-মা আর স্ত্রী। ছোট একটা ঘর আমাকে ছেড়ে দিল। জায়গাটা আমার খুব মনে ধরে গেল। যেন প্রকৃতির কোলে আশ্রয় পেলাম। এখানকার জল-হাওয়ায় ক্ষিদে বাড়ায়।

সন্ধ্যেবেলা কোম্পানি থেকে ফিরে স্নান সেরে উঠোনে যখন আমরা দুজন খাটিয়াতে বসতাম, স্নিগ্ধ বসন্তের বাতাস মন-প্রাণ জুড়িয়ে দিত। মনের শান্তি আর কানের শান্তি। এরপর দিবাকরের বউ কাঁসার গ্লাসে করে মোষের দুধের চা করে আনত! আহা, তার স্বাদ এখনও ভুলতে পারিনি। চা খেয়ে সন্ধ্যের অন্ধকারে লালচে সরু রাস্তা ধরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতাম। একটাই অসুবিধে, এই অঞ্চলে এখনো বৈদ্যুতিক আলো আসেনি। ও বলল খুব শিগ্গিরই এসে যাবে।

সেদিন দিবাকর টর্চ আর একটা থলে নিয়ে বেরোল। কিছু মুদিখানার জিনিস কিনবে। ওর বাবা হাঁটু পর্যন্ত ধুতি তুলে দাওয়ায় বসে হুঁকো টানছে। ওরা হিন্দিতেই বেশি কথা বলত। কিন্তু বাংলা বুঝতে পারত। দিবাকর

ভালো বাংলা বলতে পারত। কেননা ওর বাবা আসানসোলের কোলিয়ারিতে কাজ করত। সেহেতু আমার সঙ্গে কথাবার্তায় অসুবিধে হত না।

মুদিখানার দোকানে গিয়ে দেখি একজন অল্প বয়স্কা বিধবা মহিলা কেনাবেচা করছে। ফেরার সময় দিবাকর বলল, 'ঐ মেয়েটির নাম সুমরি। ওর স্বামী এক বছর আগে মারা গেছে। কতই বা বয়স হবে প্রসাদের? গাঁট্টাগোট্টা পেশীবহুল চেহারা। জানি না বিশ্বাস করবেন কি না... ওর মৃত্যুটা আমি আজও রহস্যজনক মনে করি।'

রহস্যজনক কথাটাতেই আমার মনে প্রথম কৌতূহলের জন্ম দিল। 'কীরকম রহস্যজনক একটু শুনি?'

টর্চের আলোয় পথ চলতে চলতে দিবাকর বলল, 'সে এক আজব ঘটনা। গ্রামের কেউই কুলকিনারা করতে পারেনি। আপনি শুনলে ভাববেন আজগুবি গল্প শোনাচ্ছি।'

ওর গলার স্বরে একটা ভয়ের হালকা ছোঁয়া পেলাম। এর ফলে আমার আগ্রহটা বাড়ল।

— 'বলে ফেলো। শুনি মৃত্যুর কারণটা।'

— 'বাড়ি এসে গেছে। রাত্রে খেয়েদেয়ে শুতে যাবার আগে শোনাব।'

কী আর করি, অগত্যা অপেক্ষা।

রাত ন'টা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া সেরে ওদের উঠোনের খাটিয়ায় এসে বসলাম। এর মধ্যে চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। দাওয়াতে একটা হারিকেন জ্বলছে। দিবাকরের বউ ঘরের ভেতর শাশুড়ির পা টিপে দিচ্ছে। আমাদের মাথার ওপর কালো আকাশের গায়ে অসংখ্য নক্ষত্র মিটমিট করছে। বসন্তের হাওয়া ক্রমশ হিমেল হচ্ছে।

— 'নাও, শুরু করো, প্রসাদের মৃত্যু কাহিনী।' আমার কণ্ঠে আগ্রহ।

দিবাকর গলাটা একটু ঝেড়ে নিল।

— 'এখন ওদের বাড়ির সামনে যে মুদির দোকানটা দেখলেন, ওটা প্রসাদ মারা যাওয়ার পর পেট চালাতে ওরা খুলেছে। কেননা প্রসাদের বুড়ি মা আর বউ ছাড়া সংসারে কেউ নেই। আগে প্রসাদের কাজ ছিল পাহাড়ের জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করা। এ কাজ অনেকেই করে। ও প্রতিদিন ভোর থাকতে কুঠার, কাটারি আর দড়ির বাঁক নিয়ে টিলায় উঠে যেত। তারপর কাঠ নিয়ে বাজারে বেচে বিকালের দিকে বাড়ি ফিরত। সেদিনও রুটিন অনুযায়ী বেরিয়েছিল।'

ও অল্প থামল। আমি শরীরটা খাটিয়ায় ছড়িয়ে দিলাম।

'সেদিন প্রসাদ বাড়ি ফিরল বেলা করে খালি হাতে। বাড়ির লোকেরা প্রথমে ভেবেছিল কাঠ পায়নি বা শরীর খারাপ। কিন্তু ওদের ভুল ভাঙল একটু বাদেই। প্রসাদের মুখ-চোখের একটা পরিবর্তন ওদের চোখে পড়ল। তারপরেই এল ধুম জ্বর! তার সঙ্গে ভুল বকা — এখানকার লোকেরা ডাক্তারের থেকে ভৈরববাবাকে বেশি বিশ্বাস করে। ওষুধের থেকে জলপড়া-তাবিজে বেশি আস্থা রাখে। ভৈরববাবা দেখেই বলল বুরা বাতাস লেগেছে। কোম্পানি থেকে ফিরে ওদের বাড়ি গেলাম। তখনও জ্বরে বেহুঁশ হয়ে চাটাইয়ে পড়ে আছে। কুপির আলোয় দেখলাম মাথার কাছে একটা কচুপাতায় খানিকটা তেল-সিঁদুর মাখানো বেলপাতা। ভৈরববাবার ঔষধি। বুঝলাম ডাক্তারের ধারেকাছে যায়নি ওরা। প্রসাদের সারা মুখে লাল লাল ফুসকুড়ি! আমার আওয়াজ পেয়ে তাকাল। চোখ দুটো লাল করমচার মত। বিড়বিড় করে বলল, "...সাবধান দিবাকর, উয়ো পেড় জিন্দা হ্যায়...।"

'একই কথা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে চলেছে। মাথায় আসছে না ও কী বলতে বা বোঝাতে চাইছে। তবে পেটে যেটুকু বিদ্যে আছে তার জোরে বুঝলাম — ঐ জঙ্গলে নিশ্চয়ই ওর সাথে কিছু একটা আজব বা অলৌকিক কান্ড ঘটেছে, ওর মন এবং মাথা সেই ভার নিতে পারেনি! বারবার সে কথা ওকে জিজ্ঞেস করলাম। ওর সঙ্গে আর কেউ ছিল কিনা? আমার দিকে বোবার মত শুধু চেয়ে রইল। ভালভাবে দেখলাম ওর দু'চোখের ভেতর অজস্র আতঙ্ক দানা বেঁধে রয়েছে!

ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললাম কাল সকালেই ওকে নিয়ে হাসপাতাল যেতে হবে। কিন্তু ভোররাতেই আমার বাড়িতে গ্রামের লোক ডাকতে এল। প্রসাদের শেষ অবস্থা। ছুটলাম ওখানে। ওকে দেখে বেশ ভয়ই লাগল। ওর মুখটা নীলচে হয়ে গেছে। গলার শির ফুলিয়ে বলে চলেছে সেই এক কথা — "পেড় বিলকুল জিন্দা! ছোটা ভি জিন্দা হ্যায়।" ওর কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। ক্রমশ ওর গলার আওয়াজ কমে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ ওর গলাটা টিপে শ্বাস রোধ করে ওকে মারছে! আমি ওর শেষ কথাগুলো শোনার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসে কানটা মুখের কাছে নিয়ে গেলাম। একটু বাদেই ও মারা গেল।'

দিবাকর একটানা কথা বলে একটু চুপ করল। একমনে গল্পটা শুনছিলাম। ইতিমধ্যে ওর বউ ঘরে চলে গেছে। পাহাড়ের দিক থেকেই একটা ঠান্ডা হাওয়ার স্রোত ভেসে আসছে। উঠে বসলাম।

'প্রসাদের জীবনের শেষ কথাগুলো বলো, যা একমাত্র তুমি শুনেছিলে।' ও যা বলল তাতে আমার শরীরেও একটা অদ্ভুত শিহরণ অনুভূত হল! এবং তার সঙ্গে মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কৌতুহলটা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল ঐ অদ্ভুত রহস্য জানবার জন্য।

আমি দাঁড়িয়ে উঠেছি। ওর মুখ থেকে প্রসাদের শেষ কথাগুলো শোনবার জন্য।

একটু দোনামোনা করে দিবাকর বলল, 'দেখুন স্যার, আমরা জানি মৃত্যুপথযাত্রী মিথ্যে কথা বলে না। প্রসাদ যা বলেছিল তার সারাংশ হল, ছোট শিমুল গাছটা কাটাই তার ভুল হয়েছে। কেননা বড় শিমুলটা আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। বাধাও দিচ্ছিল নানান ছলে! কিন্তু ও গা করেনি। আর সব কাঠুরেরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। ধারালো কুঠারের এক কোপ যেই ছোট গাছটার ডালে বসিয়েছে....অমনি! উঃ কি ভয়ঙ্কর! মনে হল একটা জলজ্যান্ত মানুষের ডান হাতটা কেটে ফেললাম! এবার দেখলাম ঝাঁকড়া বিরাট গাছটা যেন রাগে ফুঁসছে! আমার সামনে ঠিক একটা দানব দাঁড়িয়ে আছে। তারপর...'

'তারপর?' আমার মুখে প্রশ্ন।

দিবাকর বলল, 'এরপর আর একটা বাক্যও বলে যেতে পারেনি।' এইসময় দূরের কোনো গাছ থেকে কয়েকটা প্যাঁচা কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল। আমার সারা মন পরবর্তী ঘটনা জানার জন্য পাগল হয়ে উঠল। মনে হতে লাগল এই মুহূর্তে ছুটে টিলাটার ওপর উঠি। চুম্বকের মতো সেই অদেখা জায়গাটা টানতে লাগল। মনটাকে সাময়িকভাবে সংযত করলাম।

'চলো শুয়ে পড়া যাক। রাত হল।' ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। আমি জানি, এখুনি চোখে ঘুম আসবে না। খালি মাথায় ঘুরছে... প্রসাদ ওখানে কী দেখেছিল? যাতে মনে হল গাছগুলো জ্যান্ত? আর বাকিরা... তাদের গাছগুলো জীবন্ত হল না কেন? ও ভুল দেখেনি তো? কেননা এত অবাস্তব... কেউ বিশ্বাস করবে? হঠাৎ দিবাকরের কথাটা মনে পড়ে গেল। মৃত্যুপথযাত্রী মিথ্যে কথা বলে না। তবে কি সত্যি ওখানে জীবন্ত গাছ আছে? আমরাও তো জানি গাছের প্রাণ আছে। তাহলে একবার ওখানে যাওয়া দরকার। এত কাছে এসে এমন জিনিস না দেখে ফিরে যাব? এইসব কথা চিন্তা করতে করতে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুমের ঘোরে দেখি একটা ঝাঁকড়া পাতাভর্তি শিমুল গাছ মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই ছোট একটা গাছ। বড় গাছটা যেন মাতৃস্নেহে সন্তানকে ডালপালা দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে। আশ্চর্য দৃশ্য! সকালে ঘুম ভাঙতে স্বপ্নের কথাটা মনে পড়ল। আবার শুরু হল চিন্তার জট। প্রসাদকে সে কীভাবে হত্যা করল? কী এমন বিষ ছড়াল যে জোয়ান লোকটা দু'দিনের জ্বরে মুখে রক্ত তুলে মরে গেল? এইরকম একটা রোমহর্ষক কাহিনীর উৎস স্থলে এসেও না দেখে ফিরে যাব?

মানুষের অদম্য কৌতূহলই তাকে বারে বারে বিপদের মধ্যে ফেলেছে! তবু মানুষ তার কৌতূহল বৃত্তি দমন করতে পারেনি। কোম্পানির কাজের টেবিলে বসে মনস্থির করে ফেললাম। যাই ঘটুক, দেখতেই হবে ঐ জ্যান্ত গাছটাকে! আমি তো তার কোনো ক্ষতি করতে যাচ্ছি না!

দিবাকরকে কথাটা বলতেই ও বিষম খেল।

'স্যার, আমার মনে হয় ওখানে না যাওয়াই ভাল। কেননা আমরা প্রসাদের কথা অনুযায়ী ভৈরববাবাকে নিয়ে জায়গাটার কাছাকাছি গিয়েছিলাম। উনিও সব দেখে শুনে বলেছিলেন ওখানে অপদেবতারা থাকে! গ্রামের লোকজন তারপর থেকে ঐ পথ মাড়ায় না। জায়গাটা সত্যিই নির্জন আর গা ছমছমে! গাছগুলোও কেমন ভয়ঙ্কর টাইপের। একটু হাওয়া দিলে মনে হয় কে যেন করুণ সুরে ইনিয়ে—বিনিয়ে কাঁদছে!'

ওর কথায় গায়ে একটা শিরশিরানি উপলব্ধি করলাম। কিন্তু ঐ যে বললাম... কৌতূহল! ভয়ের সাথে যাবার ইচ্ছেটাও বেড়ে গেল। বললাম, 'তোমার যদি যেতে আপত্তি থাকে, আমাকে ঐ পাহাড়টার নিচ পর্যন্ত পৌঁছে দাও। এরপর একাই আমি উঠব।'

মাথায় এল না নির্দিষ্ট স্থানটা চিনব কিভাবে। ও আমার মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনি আর একবার ভাবুন। জেদের বশে কিছু করবেন না। বাড়িঘর ছেড়ে এতদূর এসেছেন! যদি সত্যি কোনো বিপদে পড়েন...'

দিবাকর ওর কথা শেষ করতে পারার আগেই বলে উঠলাম, 'প্রথমেই বলি, যতই মরণপথের যাত্রী হোক... ওর কথা বিশ্বাস করা মানে অলৌকিক ঘটনাকে প্রশ্রয় দেওয়া। এখনও পর্যন্ত এইরকম কাহিনী কেউ শোনেনি বিশ্বাস তো দূরের কথা। তুমিও কিছুটা লেখাপড়া জানো। তুমিও অনুভব করেছ — চোখে দেখেছ কি?' উত্তর দিতে পারল না দিবাকর। একই সঙ্গে এটাও বুঝল আমাকে নিবৃত্ত করা যাবে না।

আমতা আমতা করে বলল, 'বেশ, আগামী রবিবার দু'জনে যাব। যতই হোক, আপনাকে একা ছেড়ে দিতে পারি না। কেননা আমাদের বাড়িতে থাকেন। ভালো মন্দ কিছু হলে...'

— 'খারাপটা আগে ধরছ কেন? আমরা ওদের ধ্বংস করতে তো যাচ্ছি না।' ওকে অভয় দিলাম।

— 'কিন্তু স্যার, আমার বাড়িতে বা পাহাড়পুরে কারোর কাছে মুখ খুলবেন না। তাহলে কিন্তু যাওয়া পন্ড!'

ওর কথায় সায় দিলাম। পা দুটো যেন এখুনি ছুটে চলে যেতে চাইছে অজানা রহস্যকে জানতে!

কিন্তু তখনও বুঝিনি প্রকৃতির কিছু রহস্য জানতে নেই এবং সেও সেই রহস্য উন্মোচন করতে চায় না! যেমন গভীর সমুদ্রের ভেতরের রহস্য, বারমুডা ট্রায়াঙ্গল... আমাজনের গভীরে নিয়মিত কত কী ঘটে চলেছে... মূর্খের মতো নিজের অজান্তেই নিজের মৃত্যুর পরোয়ানায় সই করে দিলাম।

রবিবার খুব ভোরে আমরা মোটর বাইক চেপে বেরোলাম। বাড়িতে বলা হল কোম্পানির কাজে বেরোচ্ছি। একটা ব্যাগে কিছু শুকনো খাবার আর দু'বোতল জল নেওয়া হল। দিবাকর একটা সরু কাস্তের মতো কাটারি ভরে নিল। যেতে যেতে বললাম।

— 'কাটারিটা নিলে কেন?'

— 'ঐ সরু পাহাড়ি রাস্তায় গত এক বছরে কেউই যায়নি। তাই আগাছা আর বুনো লতাপাতায় ভরে থাকবে। কেটে সাফ করতে করতে উঠতে হবে।'

সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে একটা সরু নদীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। ও বাইকটা একটা ঝোপের আড়ালে রেখে দিল। নদী বলতে একদম শুকনো। মাঝে মাঝে পাথরের খাঁজে কিছু জলের রেখা। সোনালী রোদ চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। চারিধার নির্জন, কোনো জনমনিষ্যি নেই। পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে আমরা নদী পেরোলাম। সামনেই দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের মতো সবুজ টিলাটা। সারা মনে একটা সুপ্ত উত্তেজনা খেলা করছে।

টিলাটার নিচে এসে দাঁড়ালাম। ঘাড় উঁচু করে ওপরের দিকে তাকালাম। একটা নুড়ি পথ এঁকেবেঁকে ওপরের দিকে উঠে গেছে। দিবাকর দোটানার সুরে বলল, 'এই সেই পথ। পারবেন তো উঠতে?' বুঝতে পারছি ওর মন এখনও ভয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

'চিন্তা করো না। ঠিক উঠে যাব।'

শুরু হল চড়াই ভেঙে ওপরে ওঠা। ঝোপঝাড়গুলোতে নানা রঙের প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে বুনো গাছের মেঠো গন্ধ। কিছু কিছু জায়গায় পাহাড়ি পথটা এরই মধ্যে গুল্ম লতাপাতায় ছেয়ে গেছে। দিবাকর হাতের কাটারি দিয়ে সেগুলো কাটতে কাটতে ওপরে উঠছে। তার পিছনে আমি। খানিকটা ওঠার পর কপালে ঘাম জমল। শহুরে মানুষ পাহাড়ে চড়ার অভ্যেস নেই। ভাবছি এই দুর্গম পথ বেয়ে প্রসাদরা কাঠের বোঝা নিয়ে কিভাবে প্রতিদিন যাওয়া আসা করত?

একটু দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে নিচের দিকে তাকালাম। রুক্ষ পাথরে ভরা নদী এখন অনেক নিচুতে। আমাকে দাঁড়াতে দেখে দিবাকরও দাঁড়িয়ে গেল।

'একটু জল খাবেন?'

ঘাড় নাড়ালাম। ও বোতলটা দিল।

এক ঢোঁক গলায় ঢেলে বললাম, 'আর কতদূর?'

ও ঘাড় চুলকে বলল, 'এখনও অনেকটা। একেবারে পাহাড়ের মাথার কাছে।' আবার শুরু হল পথ চলা। পায়ের নিচের পাথরগুলো ক্রমশ পিছল হচ্ছে। কেননা লতাপাতার মাড়ানো রসে শুকনো পথ পিচ্ছিল আকার ধারণ করছে। মাঝে মাঝেই বড় বড় গাছ জায়গাটা ছায়া করে রেখেছে। বেশির ভাগ গাছে কাঠঠোকরার বাসা। তাদের ডাক কানে আসছে।

এই সময় প্রথম বিপদের সম্মুখীন হলাম। হঠাৎ করে আমার পায়ের ক্যাম্বিস জুতোটা হড়কে গেল। টাল সামলাতে পারলাম না। কয়েক ধাপ নিচে গড়িয়ে পড়বার মুহূর্তে আশপাশের লতানো গাছগুলোকে প্রানপণে আঁকড়ে ধরলাম। পড়ন্ত শরীরটা আটকাল। দিবাকর লাফিয়ে নেমে এসে আমায় তুলল। হাতের কনুইটা ভালো রকম ছড়ে গেল।

উদ্বিগ্ন গলায় ও বলল, 'যত ওপরে উঠবেন পথ তত পিছল। অভ্যেস নেই আপনার। এখনও বলছি, ফিরে চলুন।'

জেদ চেপে গেল। কিন্তু মাথায় একটা কথা ঘুরপাক খেতে শুরু করল। তবে কি কেউ আমাকে বাধা দিয়ে সামনের ভয়ঙ্কর বিপদের কথা জানান দিচ্ছে? আমার মস্তিস্ক কি আমায় সাবধান করে দিতে চাইছে? কেউ কি চাইছে না অজানা রহস্য পুনরায় উন্মোচন হোক?

কনুইটা রুমাল বার করে মুছতে মুছতে বললাম, 'সামান্য দুর্ঘটনা। ভেবো না। এবার সাবধানে উঠব।'

ও কাঁধ ঝাঁকাল। শুরু করলাম চড়াই ভাঙা। সাড়ে আটটা বাজছে। তার মানে এক ঘণ্টা মত সময় ক্রমাগত উঠেছি। নিচের দিকে তাকিয়ে আর নদীটাকে দেখতে পেলাম না। জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে। এখানকার পরিবেশটা অল্প স্যাঁতসেঁতে। কয়েকটা নাম-না-জানা গাছ জায়গাটাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে। গাছের ডালে পাতায় অসংখ্য মাকড়সার জাল। নিস্তব্ধ, নির্জন চতুর্দিক।

এই সময় নীরবতা ছাপিয়ে একটা গুনগুন শব্দ কানে এল। দিবাকরও কান খাড়া করে শব্দটা শুনে আশেপাশে তাকাল। এরপরেই আমাদের দৃষ্টি পড়ল সামনের পলাশ গাছটার দিকে। বিরাট একটা মৌচাক। সেখানে লাখো লাখো মৌমাছির ভিড়। এত বড় মৌচাক জীবনে দেখিনি। দিবাকরের মুখে চিন্তার ছায়া। আসলে মৌচাকটা এত নিচের দিকে আর ওর পাশ দিয়েই আমাদের উঠতে হবে।

ও বলল, 'আমাদের হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হবে। একটু ছোঁয়া লাগলেই...'

ওর গলা কাঁপছে। হামাগুড়ি দিতে গিয়েই কনুইয়ের কাছে ব্যথাটা মালুম হল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে জায়গাটা পেরোলাম।

দিবাকর অল্প উত্তেজিত স্বরে বলল, 'সামনের বড় পাথরটা দেখতে পাচ্ছেন... ওটা ডিঙোলেই আমাদের প্রসাদের মৃত্যু স্থান। রহস্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে যাব।'

ওর কথায় মনের মধ্যে চাপা উত্তেজনাটা চোখে মুখে ফুটে উঠল। অভীষ্ট সিদ্ধ হতে চলেছে! মনে হচ্ছে এভারেস্ট জয়ের থেকেও বেশি কিছু করতে চলেছি। শরীরের হারানো শক্তি যেন ফিরে এল। আমরা এগিয়ে

গেলাম পাথরটার দিকে।

দিবাকর বাঁ হাতটা পাথরের ওপর রাখতেই ফাটল থেকে একটা খয়েরি বিরাট তেঁতুলে বিছে বেরিয়ে এল। যেন ছোটখাটো একটা সাপ!

'দি-বা-ক-র!!!' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। বিছেটা তার হলুদ রঙের হুলগুলো খাড়া করে ফেলেছে ফোটাবার জন্য। আমার চিৎকার শোনা মাত্র ও বোধহয় সেকেন্ডরও কম সময়ে ডান হাতের কাটারিটা দিয়ে ওটাকে আঘাত করল। বিছেটা ছিটকে আমার পায়ের কাছে এসে পড়ল। তারপর সরসর করে পাশের জঙ্গলে ঢুকে গেল। বিরাট ফাঁড়া গেল। ওটা কামড়ালে কি হত ভাবতেই গা-টা শিরশির করে উঠল। তৃতীয় বাধা পার হয়ে পাথরটার ওপর উঠতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল সবুজ মাঠের মতো খানিকটা ফাঁকা জমি। তার মানে টিলাটার মাথায় উঠে এসেছি। গাছপালা বেশি না থাকার জন্য সূর্যের দেখা পেলাম। দুজনেই ক্লান্ত। দিবাকর আঙ্গুল তুলে দেখাল, 'ঐ দেখুন, সামনে ঐ নরখাদক শিমুল গাছ! পাশেই ওর বাচ্চাটা।'

আমি অবাক। আশ্চর্য! হুবহু এই গাছ দুটোকে স্বপ্নে দেখেছি! এ কী করে সম্ভব? অচেনা, অজানা এই দুর্গম স্থানের ছবি আমার স্বপ্নে এল কী করে? ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না। নজরে পড়ল ছোট গাছটার একটা ডাল কাটা। এই কাটা ডালটাই প্রসাদের মৃত্যুর কারণ। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। গাছ দুটোর কাছাকাছি কোনো গাছ নেই। এরা দু'জন যেন বিচ্ছিন্ন। এক পলক দেখলে মনে হবে ডান হাত কাটা একটা বাচ্চা তার মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আর মা একটা হাত তার সন্তানের মাথায় দিয়ে রেখেছে।

এতক্ষণ উত্তেজনার জন্য খিদেতেষ্টাগুলো চাপা ছিল। এবার বাড়তে শুরু করল। দিবাকর আমার মনের ভাষা বুঝতে পারল। ও হাঁটু গেড়ে বসে ব্যাগ থেকে দুটো পাঁউরুটি আর মিঠাই বার করল। পাঁচ মিনিটেই খাওয়া শেষ করে জল খেলাম। আমরা দু'জনে বসে গাছ দুটোর দিকে তাকিয়ে রয়েছি। আমাদের থেকে দূরত্ব বড় জোর পঞ্চাশ-ষাট হাত হবে। মনে হচ্ছে ওরাও একমনে আমাদের চালচলন লক্ষ্য করছে। বোধহয় বুঝতে চেষ্টা করছে আমাদের উদ্দেশ্য।

আচমকা একটা বোঁটকা ঘামের গন্ধ নাকে ভেসে এল। আমাদের গায়ের গন্ধ? কই এতক্ষণ তো পাইনি? দিবাকরও নাক টানে বলল, 'একটা বিদঘুটে ঘামের গন্ধ পাচ্ছেন?' সায় দিলাম।

মনে হচ্ছে এক সার জংলী মানুষ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের গায়ের বুনো গন্ধ নাকে ঢুকছে! এবার দেখলাম বড় গাছটার পাতাগুলো থিরথির করে কাঁপতে শুরু করল। বাতাসে কাঁপছে? কিন্তু বাচ্চা গাছটার পাতাও তো কাঁপত। ওগুলো তো স্থির! দিবাকর বড় বড় চোখে দেখছে। আমাদের অবাক করে মা গাছটার দুটো ডাল একটু নিচে নেমে এসে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরল! যেন আমাদের হাত থেকে রক্ষা করার তাগিদে।

সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিন্ডটা লাফ মেরে উঠল। আমরা ভুল দেখছি না তো? এ তো সত্যি অবিশ্বাস্য! প্রসাদের কথায়... জিন্দা পেড়! আমরা দুজনেই দূরে চুপচাপ বসে আছি! তাহলে ওরা ভয় পাচ্ছে কেন?

এইসময় আমার চোখে পড়ল সামনে পড়ে থাকা কাটারিটা! বিদ্যুতের মতো মাথায় খেলে গেল এই অস্ত্রটাই তাহলে আসল কারণ? ওরা অত দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে? বিড়বিড় করে বললাম, 'কাটারিটা ব্যাগে ঢোকাও।'

দিবাকর তাই করে উঠে দাঁড়াল।

'ফিরে চলুন। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা ঠিক নয়। ওরা বিলকুল জ্যান্ত।' ওর মুখে রীতিমতো ভয়।

'যা দেখার, আপনি দেখে নিয়েছেন। আরও কিছু দেখার চেষ্টা না করাই ভাল। তারপর হয়ত প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব না।' বলে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

ওর কথা শুনে সেইসময়ই ফিরে আসা উচিত ছিল। তাহলে ঐ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে হত না...

দিবাকর ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই ওর হাতটা ধরলাম।

'ভয় পেও না। ব্যাগটা এখানে রেখে খালি হাতে গাছটার কাছে যাব। কাটারি ছাড়া গেলে দেখি ওদের কী প্রতিক্রিয়া হয়?' তাহলে আমিও মেনে নিচ্ছি ওরা জীবিত! আমাদের মতো ওদেরও ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ।

ও ভৈরববাবার কথা আবার বলল, ‘উনি নিষেধ করেছিলেন। তবু আপনার কথায় এখানে এসেছি। প্রসাদের মৃত্যুর কথাটা ভাবুন।’

আমি ওর পিঠে হাত দিলাম। ‘তুমি লেখাপড়া জানা লোক। ঐসব ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করো? তাছাড়া গাছগুলোর একটাই প্রতিবন্ধকতা ওরা আমাদের মতো দৌড়তে পারে না। সেইরকম বিপদে পড়লে ছুটে পালাব।’

তবু ওর মনের ভয় কাটাতে পারলাম না। অগত্যা বললাম, ‘বেশ, তুমি এখানেই দাঁড়াও। আমি গাছটার কাছে গিয়ে একবার দেখে আসি।’ ও অসহায় গলায় বলল, ‘গাছে হাত দিয়ে দেখবেন... জ্যান্ত কি না?’ বুঝতে পারছি ও এই স্থান থেকে পালাতে চাইছে। একটু আগেই যা দৃশ্য দেখেছি তাতে পালানোই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মন বলছে এখনও কিছু দেখার বাকি আছে। সেই শেষ দেখার ইচ্ছে আমাকে আকর্ষণ করছে। সম্মোহিতের মত এগিয়ে চললাম গাছটার দিকে। ও পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল বিস্ফারিত চোখে।

অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছি। এত কাছে চলে এসেছি যে শিমুল গাছ দুটোকে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। ঘামের উগ্র গন্ধটা সারা দেহে যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওদের গা থেকে আসছে নাকি? কথাটা মনে আসতেই একটু শিউরে উঠলাম। মাথার ওপর ডালপালা বিস্তার করে গাছটা দাঁড়িয়ে। চোখে পড়ল ওর বিরাট কান্ডটা এবং তখনই আমার যেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জাগ্রত হল। ভয়ার্ত চোখে দেখলাম ওর মোটা কান্ডটা মানুষের বুকের মতো ওঠানামা করছে।

শেষ প্রশ্ন জানার জন্য দুরু—দুরু বুকে দু’হাত দিয়ে গাছটাকে ছুঁলাম। এক লহমায় সারা শরীরে জমে থাকা ভয়টা আতঙ্কের আকার নিল। একি! ঠিক যেন দাঁড়িয়ে থাকা কোনো মানুষের শরীর ছুঁলাম। যার সারা দেহ ঘামে জবজব করছে!

বোধহয় এক মিনিটও হবে না দিবাকরের বিকট চিৎকার কানে আছড়ে পড়ল।

স্যার, ওপরের দিকে তাকান!!’

ওপরে তাকাতেই সারা শরীর অবশ হয়ে এল। একটা কালো মোটা ডাল বিদ্যুৎগতিতে নিচে নেমে আসছে আমার মাথা লক্ষ্য করে। যেন কোনো দানব তার লৌহমুষ্টি দিয়ে আঘাত করতে চলেছে। ছেঁড়া ধনুকের ছিলার মতো এক লাফ দিয়ে পিছতেই ডালটা সপাটে এসে পায়ের কাছে পড়ল। এক চুল সময়ের এদিক-ওদিক হলে এতক্ষণে আমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যেত।

কী ভয়ানক প্রতিহিংসা! ওপর দিক থেকে মড়মড় আওয়াজে আমার মস্তিস্ক সজাগ হল। আরও একটা শুকনো ডাল আপনা থেকেই ভাঙতে শুরু করেছে। এরপর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা আত্মহত্যার সামিল। দৌড়ে এগোলাম দিবাকরের দিকে। ও আমার আসার প্রতীক্ষায় যেন অপেক্ষারত।

এবার শুনতে পাচ্ছি মেঘমুক্ত আকাশে ঝড়ের শব্দ। হু হু বেগে ছুটে আসছে এক বিরাট ঝড়! আশেপাশের গাছগুলোতেও লেগেছে ঝড়ের কাঁপন! আমরা দু’জন লাফিয়ে বড় পাথরটার কাছে পৌঁছতেই এক রাশ ঝরা শুকনো পাতা আর কাঠিকুটি উড়ে এল আমাদের লক্ষ্য করে। সরু সরু ডাল তীব্র বেগে মুখে মাথায় লাগছে। যেন কারা ঝাঁকে—ঝাঁকে তীর ছুঁড়ছে! পাথরটা ডিঙিয়ে নিচের পথ ধরলাম।

ভাবতে পারছি না এই অসম্ভব ব্যাপারগুলো ঘটছে কীভাবে? তবে কি গাছেদের সাথে প্রকৃতিও কি আমাদের ওপর রুষ্ট? একটু নামতেই চোখের সামনে আরও এক বিভীষিকা দেখতে পেলাম! প্রবল বাতাসের ধাক্কায় সেই বিরাট মৌচাক ছেড়ে হাজার হাজার মৌমাছি চারিদিক কালো করে উড়ে বেড়াচ্ছে।

দিবাকর কোনোও রকমে বলল, ‘কিছু করার নেই। ঐ ঝাঁকের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। শুধু চোখ দুটো বাঁচাবার চেষ্টা করবেন।’

বুঝতে পারছি আমার গোঁয়ার্তুমির জন্যেই মহা বিপদে পড়া। অতগুলো মৌমাছি যদি হুল ফোটায়? বুক থেকে কান্নার একটা ডেলা উঠে আসতে চাইছে। এ যেন যেচে ফাঁসির দড়ি গলায় পরা! তবে কি প্রসাদও

এইরকম মৌমাছির বিষের শিকার হয়েছিল?

আমরা পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ আড়াল করার চেষ্টা করলাম। হাস্যকর প্রয়াস! প্রথম হুলটা পিঠে ফোটাবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল পিঠে কে যেন গরম ছুঁচ ঢুকিয়ে দিল। ঐ জায়গাটা পেরোতে গিয়ে কমপক্ষে কত কামড় খেলাম জানি না। কেননা প্রাণের মায়া বড় মায়া। মনে হচ্ছে আমরা গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে নেমে চলেছি। পিছনে তাড়া করে আসছে কালান্তক যমের মতো সমস্ত বৃক্ষরাজি, পাখি, কীটপতঙ্গ — তার সঙ্গে প্রকৃতি। মনে হচ্ছে সকলে একজোট হয়েছে আমাদের চরম শিক্ষা দিতে।

নিচে নদীটা দেখা যাচ্ছে। আমরা পৌঁছতে পারব তো ওখানে জীবন্ত অবস্থায়? এই সময় আমাদের কানের কাছে কারা যেন রাগে হিসহিসিয়ে বলে উঠল, 'যুগ যুগ ধরে আমাদের ধ্বংস করে চলেছিস তোরা। বহু দিন চুপ করে সহ্য করে চলেছি আমরা! প্রতিনিয়ত সবুজ গাছগুলো নির্বিবাদে কেটে চলেছিস। কত পশুপাখি অকারণে মারছিস। এইটুকু জ্ঞান নেই, প্রকৃতির ভারসাম্য আমরাই রাখি। নিজেদের আবার জ্ঞানী ভেবে অহংকার করিস? আমরা অচলা অবলা বলে শুধু চিরন্তন নীরবে সহ্য করে যাব? না... আর নয়। সবুজ ধ্বংস করতে দেব না। কেননা এখান থেকেই সৃষ্টি হয় নব জীবনের বীজ, নতুন পরিবেশ। এবার থেকে আমরাও প্রতিশোধ নেব, নিজেদের বাঁচাতে।'

তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে আমরা নেমে চললাম সমতলের দিকে।



আত্মহত্যা

প্রথম পর্ব

লিপিকা আর অভীকের জমাট বাঁধা প্রেম। অবশেষে তিন বছর বাদে বিয়ের পিঁড়েতে এসে দম্পতির রূপ পেল। নতুন এক অধ্যায় শুরু হল তাদের জীবনে। দুজনেই চাকরি করে, তবে আলাদা আলাদা কোম্পানিতে। রাজারহাটে একটা ফ্ল্যাট কিনল অফিসে যাতায়াতের সুবিধের জন্য। কেননা লিপিকার শ্বশুরবাড়ি বারাসাত। রঙে-রসে বেশ ভালভাবেই দিনগুলো কাটছিল। কিন্তু সব কিছুই একভাবে যায় না। তাহলে ব্রিটিশ আজকেও শাসন করত।

একদিন সুর কাটল। অফিসে যাবার জন্যে অভীক বাথরুমে ঢুকেছে স্নান করতে। লিপিকা ডিভানে বসে অপেক্ষা করছে। অভীক বেরোলে ও ঢুকবে। কারণ অন্য বাথরুমটা বেশ ছোট। স্নান করে সুখ নেই। অভীকের স্মার্টফোনটা পড়েছিল ডিভানে। লিপিকার মনে হল হোয়াটসঅ্যাপে রাখা ওদের ভালোবাসার ছবিগুলো দেখে। ওর বিভিন্ন মুডের ছবি অভীককে পাঠাত। কিন্তু অ্যাপ খুলেই একটা ছবির দিকে ওর চোখ আটকে যায়। তারই বয়সি মেয়েটা। পরনে ফিকে গোলাপি স্কার্ট, ওপরের সাদা টপটার ডিজাইন একেবারে হিন্দি সিনেমার উঠতি নায়িকাদের মতো। এর ফলে তাকে আরও মোহিনী করে তুলেছে। মাতাল করা তার শরীরের আবেদন। ডাই করে চুলগুলো অল্প বাদামী করা করা। মুখটা পানপাতার মতো। টানা টানা দুই চোখে যৌন আবেদন। যে কোনো পুরুষ এর প্রেমে পড়তে বাধ্য। লিপিকার থেকে হাজার গুণ বেশি সুন্দরী!

লিপিকার মনে প্রশ্ন ওঠে। ইনি আবার কিনি? কোনোদিন সে এই সুন্দরীর ছবি দেখেনি! ছবিটা কয়েকদিন আগে পোস্ট হয়েছে। তাহলে কি অভীকের জীবনে এঁর নতুন আগমন? এক পলক বাথরুমের দরজার দিকে তাকায়। ছবির নিচে লিখেছে — ছবিটা কেমন হয়েছে জানাবে। ওপরে নামটা রয়েছে রুমি মুখার্জি। অভীকের স্নান মনে হয় শেষ হয়েছে। ফোনটা অফ করে রেখে দিল। লিপিকার মনের ভেতর একটা সন্দেহের ধোঁয়া দেখা দিল।

অভীক খালি গায়ে টাওয়েল পরে বেরোল। ওর ঐ সুঠাম স্বাস্থ্য দেখে প্রায়ই লিপিকা নানারকম রোমান্সের কথা বলে। একটু ফষ্টিনষ্টি চলে স্বামী-স্ত্রীতে। আজ সেসবের ধার দিয়ে গেল না লিপিকা। সোজা উঠে বাথরুমে ঢুকে গেল। অভীকের চোখে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগল। মনে মনে ভাবল — যাহ বাবা, এই একটু আগে হাসিখুশি বউটার এরই মধ্যে কি হল? মনে করতে পারল না। কি থেকে হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে গেল?

এরপর দু’জনে ডাইনিং টেবিলে খেতে বসল। লিপিকার খেতেও তেমন ইচ্ছে করছিল না। স্নান করতে করতে ওর ছোট্ট সন্দেহটা ইতিমধ্যে একটা বিরাট গল্পে পরিণত হয়ে গেছে। ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে সে ভেবে চলে। সেইজন্যে কিছুদিন ধরে অভীকের ব্যবহারে কিরকম একটা আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো ভাব! সন্দেহের ভূত একবার যদি মাথায় ঢোকে তাহলে আর রক্ষে নেই। যে কোনো মধুর সম্পর্ক বিষিয়ে উঠতে বাধ্য।

অর্ধেক খেয়ে উঠে পড়ল লিপিকা। অভীক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কী ব্যাপার শরীর ঠিক আছে তো?’

বেসিনে মুখ ধুতে ধুতে কঠিন গলায় লিপিকা বলে উঠল, ‘কেন, আমার শরীর খারাপ হলে তুমি খুশি হও?’

— 'দেখো কান্ড! কী প্রশ্নের কী উত্তর।'

অভীকের কথার আর কোনো জবাব না দিয়ে ও অফিস যাবার জন্যে ড্রেস পরতে চলে গেল। ব্যাজার মুখে অভীক বসে রইল। সে মনের ভেতর পোস্টমর্টেম করে চলল কী কারণে লিপিকা এই আচরণ করছে।

দু'জনে এক সঙ্গেই অফিস বেরোয়। অবাক হয়ে দেখল স্ত্রী বড় ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে জুতো পরছে। অভীক গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

লিপিকা বিদ্রুপের কণ্ঠে বলে উঠল, 'তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। যার কথা চিন্তা করছিলে বসে বসে তার কথাই ভাবো। পুরনো কুৎসিত বউয়ের কথা ভাবতে হবে না।'

দরজাটা জোরে বন্ধ করে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। অভীক চুপচাপ বোকার মতো এঁটো হাতে দাঁড়িয়ে রইল। এবার তার মনে চাপা রাগ দানা বাঁধছে। অকারণে গায়ে গা লাগিয়ে ঝগড়ার কী প্রয়োজন? খুলে বললেই ল্যাঠা চুকে যায়। মেয়েদের এই এক স্বভাব।

ব্যাস, শুরু হয়ে গেল জাতির বিচার!

বিরক্ত মুখে সে অফিস যাবার জন্যে তৈরী হতে লাগল। দুজনের কাছেই ফ্ল্যাটের চাবি আছে। অভীক রোজ যাবার সময় লিপিকাকে ওর অফিসের সামনে বাইকে করে নামিয়ে দিয়ে যায়। অনেকদিন বাদে এই রুটিনে ছেদ পড়ল। অনেকের জীবনে সামনা সামনি খোলসা করে কথা না বলার জন্যেই দুরত্ব বাড়ে। অনেক সময় নিজেরাই একটা অবাস্তব গল্প খাড়া করে নিই। যেমন লিপিকা অফিসে বসে কাজের ফাঁকে ভেবে চলেছে। রুমির সঙ্গে অভীকের পরিচয় কতদিনের? বিয়ের আগে কি? তাহলে তাকে বিয়ে করার কী প্রয়োজন ছিল? যে কোনো অজুহাতে এড়িয়ে যেতে পারত! যতদূর ধারণা বিয়ের পরে পরিচয় হয়েছে। ছেলেদের মন হল পদ্মপাতায় জলের মতো। একটু সুন্দরী মেয়ে তাকাল কি হাসল — ব্যাস, একেবারে গলে পড়ল! আর ঐ রুমিটাই বা কি? বিয়ে করা লোকটার সঙ্গে প্রেম? তোর একটা অঙ্গুলি হেলনে কত আইবুড়ো ছেলে পায়ে এসে লুটোপুটি খাবে!

আচমকা আরও একটা কথা মনে ভেসে ওঠে। অভীক হয়তো জানায়ইনি তার বিয়ের কথা! মনটা আরও বিষাক্ত হয়ে উঠল। অভীককে জিজ্ঞাসা করলে মিথ্যের চাষ শুরু করে দেবে। যেটা লিপিকার একেবারে না-পসন্দ। মেয়েরা সব কিছু মেনে নিতে পারে। শুধু নিজের ভালোবাসার ভাগ অন্য কেউ নেবে তা সহ্য করতে পারে না।

মাথাটা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে সে। ভালোবাসা হারানোর চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল।

অফিসে পৌঁছে অভীক একবার ভাবল লিপিকাকে ফোন করে। হঠাৎ মেজাজের পরিবর্তনের কারণ কী? সে কি কিছু অন্যায় করেছে? তাহলে খুলে বলুক। তারপরেই মত পরিবর্তন করে। ফোনে যদি আবার ভারী ভারী কথা শুরু করে? তাহলে সে নিজেও সংযত থাকতে পারবে না। মুখ দিয়ে বাজে কথা বেরিয়ে আসবে। তার ফলে শুধু লোক হাসানো হবে! বরং বাড়ি গিয়ে সামনাসামনি আলোচনা করা ভাল।

একটা প্রবাদ বাক্য আছে — সময়ে সব কাজ সারতে হয়। নাহলে দেরিই হয়ে যায়। ওদের জীবনে সেটাই মনে হয় ঘটতে চলেছে। দেখা যাক, বিধাতা পুরুষের কী ইচ্ছা। আর যে ছবি নিয়ে একতরফা সন্দেহ তার উত্তরে অভীক কী বলে?

লিপিকা ভেবেছিল তার মান ভাঙাবার জন্যে হয়তো স্বামী ফোন করবে! কাজের মাঝে উৎকর্ণ হয়েছিল। কিন্তু নিরাশ হল। সেই সঙ্গে রাগের পারদ আরও চড়ল। অফিস থেকে বেরিয়ে ফ্ল্যাটের দিকে চলল। এখন আবার গিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে। সকালে কাজের মেয়ে এসে এক বেলার রান্না করে দিয়ে যায়। মনটা বিস্বাদে ভরা। এর ওপর জ্যামে আটকাল বাস। একে প্যাচপ্যাচে গরম। ভিড় বাসে দমবন্ধ হয়ে আসছে। সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। সাতটার সময় বাবু ফিরে আসবেন। মুখের কাছে চা চাই। নিজেও চাকরি করে সে। কিন্তু সংসারে কাজের মধ্যে সে একাই। এটাই বোধহয় মেয়েদের জীবনের অলিখিত নিয়ম।

যখন লিপিকা ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছল তখন সাতটা বেজে গেছে। মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা জেগে উঠল। হয়তো অভীক দরজা খুলে এক গাল হেসে এক কাপ চা হাতে নিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। কিন্ত দরজার কাছে এসে বুঝল তার ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যে। বাবু এখনও ফেরেইনি। হয়তো ঐ রুমির সাথেই কোনো ক্যাফেতে বসে ফষ্টিনষ্টি করছে। একবারও ভাবল না, স্বামীও তো জ্যামে ফেঁসে থাকতে পারে? ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলতে খুলতে মাথাটা হিটারের মত গরম হয়ে গেল।

দ্বিতীয় পর্ব

ঘরে ঢুকে রাগের চোটে হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে সোফায় ফেলে দিল। হাতে নাইটি নিয়ে বাথরুমে ঢুকল। সালোয়ার-কামিজ ছেড়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল। মেদহীন সুন্দর গড়ন তার। মুখশ্রী খুব একটা খারাপ নয়। গায়ের রংটাই যা একটু চাপা। এর মধ্যেই তাকে একঘেয়ে লেগে গেল অভীকের?

শাওয়ারটা চালিয়ে তার নিচে দাঁড়াল ও। বৃষ্টির মতো জলধারা তার পেলব শরীরকে শীতল করে চলল। উত্তপ্ত মাথাটা স্বল্প শান্ত হল। গোলাপি রঙের স্লিভলেস নাইটি পরে বাথরুম থেকে বেরোতেই সোফার ওপর গা এলিয়ে পড়ে থাকতে দেখল অভীককে। অফিসের জামা-প্যান্টটা পর্যন্ত ছাড়েনি। চোখের কোণ দিয়ে সাদা জামাতে লিপস্টিকের কোনো দাগ আছে কিনা দেখে নিল।

অভীক ঘেমো শরীর নিয়ে দাঁড়াল, ‘অমন করে জামার দিকে তাকিয়ে কেন ডার্লিং? জামাটা তুমিই পছন্দ করে কিনেছিলে।’

ওর মন জোগানো কথার উত্তর না দিয়ে বেডরুমে ঢুকল লিপিকা। ভেজা চুল হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে শোকাবার জন্যে। অভীক একটু ক্ষুণ্ণ হল। মনের ঘরে কী জন্য এত গোঁসা সেটা মুখ ফুটে বললেই হয়! বুঝল আজ আর চা ভাগ্যে জুটবে না। অগত্যা কাঁধ ঝাঁকিয়ে সাদা টাওয়েল নিয়ে অফিসের পোশাক চেঞ্জ করে নিল। তারপর বাথরুমে ঢুকল।

এই সুযোগটাই লিপিকা খুঁজছিল। সেন্টার টেবিলে রাখা অভীকের মোবাইল নিয়ে কিচেনে গেল। প্রেসার কুকারে ডিম আর আলু সেদ্ধ করতে বসিয়ে ফোন অন করল। রুমির সেই ছবিটা বার করল। নিচে অভীক লিখেছে — ‘সত্যিই অসাধারণ ছবি। বিধাতা অনেক সময় নিয়ে মনোযোগ দিয়ে তোমায় তৈরী করেছে।’

লিপিকার কান দুটো গরম হয়ে উঠল। ছিঃ ছিঃ কিরকম নির্লজ্জ তোষামোদ! রুমি তার উত্তরে লিখেছে — ‘সাবধান, তোমার বউ যদি লেখাগুলো দেখতে পায়! সঙ্গে সঙ্গে ডিভোর্স।’

টয়লেটের দরজা খোলার শব্দ কানে আসতে ও ফোনটা যথাস্থানে রেখে এল। লোকটাকে একটা তুচ্ছ ঘৃণ্য কীটের মতন মনে হচ্ছে। পুরুষ মাত্রই কি সব এক? সুন্দরী মেয়ে দেখলেই জিভের লালা গড়ায়! কুকারে সিটি বাজল। গ্যাস বন্ধ করল সে। এই সময় অভীক এসে তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল। লিপিকার সমস্ত দেহ ঘৃণায় কিলবিল করে উঠল। এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিল, ‘আঃ, গরমে বিরক্ত কোরো না!’ বিরক্তি ঝরে পড়ল ওর মুখ থেকে।

অভীক দেখল বউয়ের মেজাজ এখনও গরম আছে। বুঝে পাচ্ছে না কেন? আবার শান্ত গলায় বলে উঠল, ‘তুমি সকাল থেকে এমন করছ কেন বলো তো? আমার অপরাধটা কি বলবে?’ লিপিকা মনে মনে ভাবে — যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানে না! আসল কথা বললে এখনই শুরু হয়ে যাবে গপ্পো বানাবার খেলা।

‘তুমি দয়া করে সোফায় বসে মোবাইল নিয়ে মহান কাজগুলো করো। দাসীবাঁদিকে রান্নাটা করতে দাও।’

অভীক বুঝল কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। হয়ত অফিসে কোনো ঝামেলা হয়েছে! গোলাপি নাইটি পরা লিপিকার সুন্দর ফিগারটা দেখে ভেবেছিল আজ রাতটা ভালো কাটবে। সে গুড়ে বালি পড়ল। সোফায় ফিরে এল। ওর মনেও এবার রাগ জমল। লিপিকা কি নিজেকে রানি এলিজাবেথ ভেবেছে? ও যদি ভেবে থাকে

সারাক্ষণ রাগ দেখাবে আর স্বামী হেটো কুকুরের মতো তার রাগ ভাঙাবে — তাহলে ভুল করছে। চা পর্যন্ত করে দিল না। টেবিল থেকে জলের বোতল নিয়ে জল খেল অভীক। তারপর সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে ব্যালকনিতে চলে গেল।

একটু বাদে অভীকের মুঠোফোনটা বেজে উঠল। লিপিকা কিচেন থেকে দ্রুত বেরিয়ে স্ক্রিনে নামটা দেখল। সুলগ্না — এ আবার কোনজন? লিপিকা ক্রমশ গর্ত থেকে খাদে গিয়ে পড়ছে। ব্যালকনি থেকে ঘরে আসার আওয়াজ পেতেই ও কিচেনে চলে এসে কান খাড়া করে রইল। অভীক কল রিসিভ করে আবার ব্যালকনিতে চলে গেল। তার মানে গোপন কথা স্ত্রীকে শোনাবে না। সন্দেহ ক্রমশ গভীর হচ্ছে। তার অজান্তে অভীক কতগুলো মেয়ের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে? তবে কি সে তার সঙ্গেও একই খেলা খেলেছে? তাকে কাটাতে না পেরে বাধ্য হয়ে বিয়ে করেছে?

রাগে গা রি রি করতে থাকে ওর। ব্যালকনি থেকে স্বামীর হাসির শব্দ ওর কানে বিষ ঢেলে চলেছে। তখনি মনস্থির করে ফেলে লিপিকা। এর যোগ্য জবাব দেবে সে। লিপিকার জীবনটা যেমন নরকে পরিণত করেছে অভীক তেমনি ও-ও মুখোশধারী রোমিওর বাকি জীবন হেল করে দেবে।

এই হল বয়সের দোষ। একবার খোলাখুলি আলোচনা করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? অভীকেরও তো কিছু বলার ছিল হয়তো। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে রান্না করতে লাগল লিপিকা।

এক টেবিলে দুজনে খেতে বসল। যেন দু'জন অচেনা মানুষ। অভীক দেখল ডিমের তরকারিতে অত্যধিক ঝাল যা ও খেতে পারে না। তার মানে ইচ্ছে করে এত ঝাল দিয়েছে। ঠোঁট-মুখ জ্বলছে। থাকতে পারল না সে, 'এত ঝাল রান্না কোনো মানুষে খেতে পারে?'

— 'মানুষ সব পারে। ভালো-মন্দ খেতে হলে রাত দিনের লোক রাখলেই পারো।' লিপিকার গলায় ডোন্ট কেয়ার ভাব।

অভীক খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে বেডরুমে চলে গেল। সবেতে খুঁত ধরা স্বভাব এই লোকটার! যেন বিরাট কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর! আমিও তো চাকরি করি, আবার এই সংসার টানি। মনের ভেতর গর্জায় লিপিকা। যখন কারোর ওপর বিতৃষ্ণা আসে, তার প্রতিটি জিনিস খারাপ লাগে। প্লেট-বাটি সিঙ্কে রেখে এসে টিভি চালিয়ে বসে লিপিকা। এই মুহূর্তে ঘরে গিয়ে স্বামীর পাশে শোবার মুডটা নষ্ট হয়ে গেছে। মাথার ভেতর চিন্তাগুলো তাকে কুরে-কুরে খাচ্ছে। ছোট থেকেই এই স্বভাব লিপিকার। নিজে যেটা ভাববে সেটাই ধ্রুব সত্য।

এদিকে ঘরে শুয়ে অভীক অপেক্ষা করছিল স্ত্রী এলে আর একবার চেষ্টা করবে জানার তার হঠাৎ রাগের কারণটা কী! কিন্তু টিভির শব্দ কানে আসতে বুঝল লাভ নেই। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে শুয়ে অভীক ঘুমিয়ে পড়ল। আর তখনই লিপিকা সিদ্ধান্তে এল — আত্মহত্যা! এক টুকরো ভুল বোঝাবুঝির জন্যে এত বড় মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত? মানুষের সন্দেহ এমন মারাত্মক জিনিস। তখন লঘু-গুরু জ্ঞান সে হারিয়ে ফেলে। যা আকছার এখন সমাজে ঘটে চলেছে। পরীক্ষায় ফেল, প্রেমে অসফল, সংসারে অশান্তি, বাবা মায়ের শাসন — একটু উনিশ-বিশ ঘটলেই চলো, সুইসাইড করে ফেলি। এই মুহূর্তে লিপিকার মতো শিক্ষিতা, চাকুরীরতা মেয়েও সেই ফাঁদে ধরা দিল।

টিভি সামনে চললেও ওর মস্তিষ্কে চলছে সুইসাইডের জোগাড়যন্ত্র। সে নিজে মরবে কিন্তু অভীককেও ফাঁসিয়ে দিয়ে যাবে যাতে বাকি জীবনটা ও গরাদের ভেতরে বসে অনুশোচনা করে। ঘড়ির দিকে তাকাল সে। এগারোটা বাজতে চলেছে। এবার তাকে একটু ঠান্ডা মাথায় প্ল্যান খাটাতে হবে। তার আগে ঘরে গিয়ে দেখতে হবে স্বামী ঘুমিয়েছে কিনা।

অন্তিম পর্ব

লিপিকা সন্তর্পণে উঠে বেডরুমে গিয়ে দরজা খুলে দেখল। নাক ডাকিয়ে তোফা ঘুমোচ্ছে অভীক। আর এদিকে সে নিজের সুন্দর জীবনটাকে আর কয়েক মুহূর্ত বাদে শেষ করে দিতে চলেছে! দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যথাস্থানে ফিরে এল।

বেশ কিছু থ্রিলার বই ও পড়েছিল। তাই মাথা খুলতে দেরি লাগল না। প্যাডের পাতা বার করে সুইসাইড নোট লিখতে শুরু করল:

'নিজেই সিদ্ধান্ত নিলাম এ জীবন আর রেখে লাভ নেই। যাকে ভালোবেসে এই জীবন শুরু করেছিলাম তার কাছ থেকেই যখন এতবড় বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ পেলাম! হ্যাঁ, আমার হাজ়ব্যান্ড অভীক কুমার রায়। জানতে পারলাম তার মতো দুশ্চরিত্র খুব কম আছে। প্রথমে ওর ফোনে রুমির ছবিটা দেখে সন্দেহ হয়। তারপর ওর টাইপ করা নোংরা লেখাগুলো সন্দেহের ভিতকে শক্ত করে। একটু আগে আবার অন্য একজন মহিলা কল করে। অভীকের মোবাইল সেট ভেরিফাই করলে আমার কথার সত্যতা জানা যাবে। আমি চাই আমার অকাল মৃত্যুর জন্যে আমার স্বামী কড়া শাস্তি পাক।

— লিপিকা রায়।

লেখাটা বার দুয়েক পড়ল লিপিকা। এতেই ওর শাস্তি হবে আশা করি। টিভির দিকে একবার তাকাল। একটা মারপিটের সিনেমা হচ্ছে। অভীকের ঘুম পাতলা হলে ভাববে বউ টিভি দেখছে। অবশ্য ঘুম পাতলা হবার সম্ভাবনা কম। ইদানিং শোবার আগে দু'পেগ করে ড্রিঙ্ক করে। নাহলে নাকি ঘুম আসতে চায় না। যেদিন দুজনে সহবাসে মিলিত হয় সেদিন শুধু মদ খাওয়া বাদ।

কিন্তু কাগজটা রাখবে কোথায়? যাতে শুধু পুলিশের চোখে পড়ে! আগে অভীকের চোখে পড়লে সরিয়ে ফেলবে। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। চিঠিটার একটা ছবি তুলে তার মায়ের হোয়াটসঅ্যাপে সেন্ড করে দিল। জানে রাত বারোটায় মা ঘুমের সাগরে। আর যখন দেখবে, তখন মেয়ে... মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। পরক্ষণেই সেটা কাটিয়ে উঠল। বরং নিজের বুদ্ধির তারিফ করল। আচমকা একটা খটকা লাগল মনে। বুদ্ধিটা এত জলদি তার মাথায় এল কী করে? মনে হচ্ছে কেউ বা কারা অগোচরে তাকে অনবরত সাহায্য করে চলেছে নিখুঁতভাবে সুইসাইড করার জন্য। মগজে কথাটা আসতেই নিজের অজান্তে শরীরে এক শিহরণ খেলে গেল। কেন জানে না মনটা একবার দুলে উঠল। ডাইনিং রুমে একা বসে আছে সে। শুধু টিভির শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। কারণ রাত্রি ইতিমধ্যে কিশোর থেকে যুবক হতে চলেছে। পাখাটা মাথার ওপর বনবন করে ঘুরে চলেছে। ঘাড় উঁচু করে পাখার দিকে তাকাল সে। যেন পাখাটা বলে উঠল, 'ভয় কি আমি তো রয়েছি!'

পাতলা ভয়ের রেশ ওর নরম শরীরকে ছুঁল! ওর মনে হল পরিবেশটা ধীরগতিতে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরিবর্তনটা কী? ও ধরতে পারছে না। সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল ঊনত্রিশ বছরের লিপিকা। চিঠিটা নিয়ে টিভির সামনে কাবার্ডের ওপর রিমোট চাপা দিয়ে রাখল। মনস্থির করে নিয়েছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবে সে। শালোয়ারের ওড়না গলায় জড়িয়ে পাখা থেকে ঝুলে পড়বে। কিন্তু কে যেন কানের কাছে গুনগুন করে বলে উঠল, ওতে রিস্ক আছে। মাঝপথে ছিঁড়ে যেতে পারে। তার থেকে মোটা প্লাস্টিক দড়ি হচ্ছে বেস্ট! যেটা ব্যালকনিতে টাঙানো আছে কাপড় শুকোতে দেবার জন্য।

'কে?'

আচমকা প্রশ্নটা ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভয়ার্ত চোখ দুটো ফাঁকা ঘরে ঘুরে বেড়াল! তবে কি অভীক চাইছে তার জীবন থেকে তাড়াতাড়ি দূর করতে তাকে? কিন্তু ও তো গভীর ঘুমে মগ্ন! বুকের স্পন্দন দ্রুত হচ্ছে। নিজেকে বোঝাল তার উর্বর মস্তিষ্কই এই কান্ড ঘটাচ্ছে। ও পায়ে পায়ে ব্যালকনির দিকে এগোতেই ওর কানের কাছে কারোর স্বস্তির শ্বাস পড়ল। আবার থমকাল সে। ও কি মনে মনে দুর্বল হয়ে পড়ছে বলে এমন মনে হচ্ছে? মনকে সংযত করল। অন্ধকার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। দড়ির দু'দিকের হুক ওর হাতের নাগালের বাইরে। হঠাৎ মনে হল এই সাততলা উঁচু ব্যালকনি থেকে লাফালেই তো কাম ফতে।

নিচের দিকে তাকাতে দুজন সিকিউরিটির লোককে দেখতে পেল। চিন্তাটা মাথা থেকে সরিয়ে দিল। এখন তাকে চেয়ার নিয়ে এসে তার ওপর উঠে ছুরি দিয়ে দড়ি কাটতে হবে। এইসব করতে গিয়ে আবার আওয়াজ না হয়! গরমে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। আর একবার চেষ্টা করতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। এই তো নাগালের মধ্যে হুকটাকে পাচ্ছে! কেউ মন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করে লোহার হুক দুটোকে খানিকটা করে নামিয়ে দিয়েছে! কে সে ? যে চাইছে তার মৃত্যুকে নিশ্চিত করতে। প্রতি পদক্ষেপে তাকে সাহায্য করে চলেছে! দড়ি হাতে নিয়ে সে ঘরে ঢুকে বারান্দার দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘরে ঢুকে ভয়ে এবার বিষম খেল লিপিকা! পাখাটা স্থির চোখে তিনটে হাত ছড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। সে কখন পাখা বন্ধ করল? তাহলে মৃত্যুভয়ে সে উল্টোপাল্টা কাজ করে যাচ্ছে যা স্মরণে থাকছে না? পাখা বন্ধ থাকার ফলে সে ঘামতে শুরু করেছে। জল তেষ্টা পাচ্ছে। রান্নাঘরে এসে ফ্রিজ খুলে ঠান্ডা জলের বোতল বার করে গলায় ঢালল। এটাই জীবনের শেষ জল খাওয়া। দাঁতে দাঁত চেপে মনকে শক্ত করল। আর তো কয়েক মিনিটের ব্যাপার। পড়ে থাকবে তার এক আলমারি ভর্তি পছন্দ করা শাড়ি-গয়না-কসমেটিক্স। শুধু থাকবে না লিপিকা।

কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে কাঁচের সেন্টার টেবিলটা পাখার তলা থেকে সরিয়ে দেয়। এর মধ্যে গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে! নাইটির বুক-পিঠ ভেজা। হাতে দড়ি নিয়ে চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়াল। খুব একটা লম্বা নয় লিপিকা। ঝুলন্ত পাখার লোহার রড নাগালে পাচ্ছে না। সারা মুখ ঘামে জবজব করছে। কপাল থেকে দু'-চার ফোঁটা ঘাম হাতে পড়ল। বরফের ফোঁটা যেন। এবার কী উপায়? এতক্ষণ যারা ওকে সাহায্য করছিল তারা কোথায় গেল? অর্থাৎ তার সূক্ষ্ম বুদ্ধিগুলো?

কথাটা মনে আসতেই কেউ যেন তার ঘাড় ধরে দৃষ্টিটা কোণায় দাঁড় করানো উঁচু টুলটার দিকে ফেরাল। টুলটার ওপর ফুলদানি রাখা থাকে। চেয়ার থেকে নেমে পড়ে সোফায় বসে পড়ে। এরই মধ্যে হাঁপিয়ে গেছে। এত গরম লাগছে মনে হচ্ছে বেডরুমে গিয়ে ঠান্ডায় শুয়ে পড়ে। টিভির শব্দটাও বড় কানে লাগছে। আসলে, রাত যত বাড়ছে চারিদিক তত নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে টিভির আওয়াজ কানে লাগছে। এক মিনিট চোখ বুজে বড় শ্বাস নিল। কানে লাগা টিভির শব্দ হঠাৎ কমে যেতে চোখ খোলে সে। রিমোট যথাস্থানে আছে। ভলিউম কী করে নিজে থেকে কমে গেল? অবাক হওয়ার আরও কিছু বাকি ছিল লিপিকার। আতঙ্কিত চোখে দেখল উঁচু টুলটা পাখার নিচে রয়েছে। সে একশো ভাগ নিশ্চিত যে টুলটা সে আনেনি এবং টিভির ভলিউমও কমায়নি! কোনো অদৃশ্য শক্তি এই ঘরে আছে যে লিপিকাকে ক্রমাগত হেল্প করে চলেছে সুইসাইডের জন্য। ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বাজছে।

লিপিকার আবার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। নিজেকে ঝাঁকুনি দিল। হয়তো মৃত্যুর আগে মানুষের মনের অবস্থা এরকম হয়। স্নায়ুগুলো ঠিকঠাক কাজ করে না। সেটাই ঘটছে হয়তো তার ক্ষেত্রে। এইসব ভেবে মনের মধ্যে থাকা ভয়টা তাড়াতে সে চেষ্টা করে। একটা পুরনো কথা ওর মনে পড়ে যায়। ছোটবেলায় ঠাকুমা বলত কখনও ছুরি, ব্লেড, কাঁচি, বঁটিতে হাত দেবে না। ওরা নাকি ডাকে! সবসময় বাচ্চাদের ভজায় বা ফুসলায়। লিপিকা বড় হয়ে কথাগুলো মনে পড়লে হাসত। আসলে বাচ্চারা যাতে ঐসব ধারালো জিনিসে হাত না দেয় সেজন্য ভয় দেখানো হত।

এখন হাসি আসছে না তার। কথাগুলো কেমন যেন সত্যি মনে হচ্ছে! নাহলে পরপর কতগুলো অবাস্তব ঘটনা ঘটে গেল। বারান্দায় দড়ির হুকগুলো কয়েক মিনিটে হাতের কাছে নেমে এল! পাখা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল! টিভির সাউন্ড কমে গেল! টুল পায়ে হেঁটে চলে এল! লিপিকার মাথায় প্রশ্নগুলো নিজেদের মধ্যে কাটাকুটি খেলে চলেছে। নাঃ, আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। ভাবনার ভূতকে ঘাড় থেকে নামানো দরকার। মনের সব শক্তিকে একজোট করে কাঁপা পায়ে ও টুলে উঠে পড়ল। এবার পাখাটা নাগালের মধ্যে কেমন যেন দাঁত বার করে হাসছে। দড়িটা রডের সঙ্গে বাঁধল। ঘর্মাক্ত নরম গলায় দড়ির ফাঁস লাগাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু প্লাস্টিক দড়িটাকে কব্জা করতে পারছে না। হাতদুটো বারে বারে কেঁপে যাচ্ছে। ঘাড় উঁচু করে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

কানের কাছে ফের ফিসফিস করে কেউ বলে উঠল, 'পারবি, পারবি। ঠিক পারবি। আমরা রয়েছি তোর পাশে।'

উঁচু টুলে দাঁড়িয়ে কণ্ঠস্বরের উৎস খুঁজতে গিয়ে এক লহমার জন্যে ফুসফুসটা বোধহয় বন্ধ হয়ে গেল। ওরা কে? ব্যালকনির বন্ধ দরজার সামনে দুটো অস্পষ্ট কালচে ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ধোঁয়াটে কালো বাঁকাচোরা হাতগুলো হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে!

আচমকা একটা বরফ শীতল অনুভূতি গলার কাছে অনুভূত হল। বিস্ফারিত চোখে দেখল দুটো কনুই পর্যন্ত কাটা হাত তার গলায় ফাঁসটা শক্ত করে বেঁধে দিচ্ছে। যেন অদৃশ্য শক্তি তাকে আর সময় দিতে রাজি নয়। আর সহ্য করতে পারল না লিপিকা। মৃত্যুর আগে এইরকম অভিজ্ঞতা সে কল্পনা করতে পারেনি। ভয়াল আতঙ্কে তার গলা চিরে তীব্র আর্তনাদ বেরিয়ে এল। সেই অন্তিম আর্তনাদ ঘরের কোণে কোণে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

উপসংহার

শোবার আগে অভীক আজ ড্রিঙ্ক করেনি। কারণ মনটা খিঁচিয়ে ছিল। লিপিকার হঠাৎ রাগের কারণ খুঁজতে খুঁজতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের মধ্যে লিপিকার ঐ অমানুষিক চিৎকার কানে এসে এক নিমেষে ঘুমটাকে তাড়িয়ে দিল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে দেখে পাশে স্ত্রী নেই। এক লাফে ঘর ছেড়ে বেরিয়েই ঐ ভয়ঙ্কর দৃশ্যের মুখোমুখি হল। তার সারা দেহের রক্ত চলাচল এক সেকেন্ডের জন্যে থেমে গিয়ে দ্রুত চলতে শুরু করল। বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে টুলের ওপর দাঁড়ানো লিপিকাকে জাপটে ধরল। কোনোরকমে ওকে নামাবার চেষ্টা করল। লিপিকা তার অবশ হাত দুটো দিয়ে অভীকের কাঁধ দুটো ধরল। তখনও ওর গলায় প্লাস্টিকের দড়ির ফাঁস আটকানো। অভীক জানে একটু এদিক-ওদিক হলে ফাঁস গলায় আটকে যাবে। তখন বাঁচানো মুশকিল হয়ে যাবে।

'প্লিজ়, তুমি এক মিনিটের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়াও। আমি চেয়ারের ওপর উঠছি।' অভীকের গলায় কাতর অনুরোধ। ঘুমচোখে চেয়ে এই দৃশ্য দেখে তার হাত-পা রীতিমতো কাঁপছে। এক মিনিটের এদিক-ওদিক হলে বিরাট বিপদ হয়ে যাবে। চেয়ারে উঠে সাবধানে বউয়ের গলার ফাঁসটা খুলে নির্জীব লিপিকাকে পাঁজাকোলা করে ঘরে এনে শুইয়ে দিল। চোখ বন্ধ লিপিকা ধীরে ধীরে শ্বাস নিচ্ছে। অভীক ভেবে পাচ্ছে না কেন এমন মারাত্মক সিদ্ধান্ত নিতে চলেছিল লিপিকা? ও ঝুঁকে পড়ে স্ত্রীর ভয়ার্ত মুখটা দেখে। মরার আগে নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়েছিল।

রাত দেড়টা নাগাদ লিপিকা কিছুটা সুস্থ অনুভব করল। মুখের সামনে উদ্ভ্রান্তের মতো অভীককে বসে থাকতে দেখে মনের মাঝে জমা রাগ দুঃখ মিলেমিশে সারা মুখে ফুটে উঠল। পরম যত্নে ওর কপালে হাত বোলাতে বোলাতে অভীক বলল, 'আমার লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেয়ে। এবার বলো তো কী কারণে তুমি শেষ পথটা বেছে নিয়েছিলে?'

— 'আমি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে তোমার ভালোবাসাকে শেয়ার করতে পারব না। তুমি শুধু আমার। একান্ত আমার।'

— 'কে বলল তোমায় আমাকে শেয়ার করতে হবে?' ভুরু কুঁচকোল অভীক।

উঠে বসে লিপিকা, 'কেন? রুমি? সুলগ্না — আরও কত কে।'

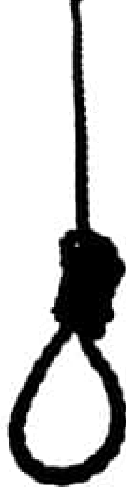
— 'রুমি ? তাকে কোথায় পেলে ? সে তো আমার দুর সম্পর্কের খুড়তুতো বোন। কানপুরে থাকে। ব্যাঙ্কে চাকরি করে। আমাদের বিয়ের সময় আসতে পারেনি। কাল সকালেই ফোন করে তোমার সন্দেহ দূর করছি। আর সুলগ্না হল আমাদের কোম্পানির অডিটর। বয়স পঞ্চান্ন। তুমি কথাগুলো আগে বললে সন্দেহ দূর করে দিতাম। এত অবিশ্বাস করো আমাকে?'

লিপিকার চোখে লজ্জার ছোঁয়া, 'যাকে প্রাণের থেকেও বেশি ভালোবাসি, সেখানেই সন্দেহ থাকে। তবে এখন মনে হচ্ছে আলোচনা করাটা হয়তো ঠিক ছিল।'

— 'যাক, চেতনা হয়েছে। এবার বলো ভয়ঙ্কর আর্তনাদের পিছনে কী রহস্য ছিল?'

লিপিকার চোখে ফুটে উঠল বীভৎস দৃশ্যগুলোর ছবি, 'আজ রাত্রে শুনতে চেয়ো না। তাহলে হয়তো ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাব। কাল সকালে দু'জনেই অফিস যাব না। সব বলব তোমায় একটু আগে যে ঘটনাগুলো আমার চোখের সামনে ঘটে গেল। আত্মহত্যার কথা মনে আনাও যে মহাপাপ এখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। অপঘাতে মরা মানুষগুলো আমাদের চারপাশে হাওয়ায় মিশে থাকে। সুযোগ পেলেই দলে টানার চেষ্টা করে।'

অভীক বুঝল কোনো ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা লিপিকার হয়েছে। এই রাতে শোনার জন্যে বেশি চাপ না দেওয়াই ভালো।



অদ্ভুত ছবি

প্রথম পর্ব

আবীর আদিসপ্তগ্রাম থেকে ফিরছিল ওর মোটর বাইকে চড়ে। কিছু ফুলের চারা আনতে গিয়েছিল গুরুপুর নার্সারি থেকে। শীতের সন্ধ্যে তাড়াতাড়ি নামছে। আবীরের বেশ কিছু গুণ আছে, যেমন — পরিপাটি করে বাগান সাজানো, অবসর সময়ে ছবি আঁকা। এক বছর হল ব্যাংকে চাকরি পেয়েছে সে। হিরো হিরো চেহারা তার। জি টি রোড ধরে ফিরছিল সে। রাস্তার দু'ধারে ফাঁকা মাঠ... ধানগুলো কাটার ফলে ধু ধু করছে। শীতের কুয়াশা মাঠময় ছড়িয়ে আছে। বেশ ঠান্ডা লাগছে। রাস্তাটাও আজ ফাঁকা। রাস্তার ধার ঘেঁষে বাইকটাকে থামাল। বক্সে সোয়েটার আছে। সোয়েটার পরতে গিয়ে চোখে পড়ল মাঠের পাশে দু'তিনটে আম গাছে ঘেরা একটা পোড়ো বাড়ি। সূর্য ডুবে গেলেও এখনও তার দু'-একটা ম্লান বিচ্ছুরিত রশ্মি কুয়াশা ভেদ করে বাড়িটার ওপর পড়ে এক মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। আবীরের শিল্পী মন জেগে উঠল। মনে হল কোনো বিরাট শিল্পীর আঁকা একটা ক্যানভাস! মুগ্ধ হয়ে গেল সে। মনে মনে ভাবল প্রকৃতির থেকে বড় শিল্পী আর কেউ হয় না। এই মনোমুগ্ধকর ছবি তাকে আঁকতেই হবে। রাস্তার পাশে একটা ছোট নর্দমা ডিঙিয়ে সে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলল বাড়িটার দিকে। সামনে থেকে কয়েকটা ছবি মোবাইলে তুলে রাখবে। তারপর সময় পেলে রং-তুলি দিয়ে ছবি আঁকবে।

কিন্তু পরিত্যক্ত বাড়িটার কাছে এসে আবীরের তেমন ভালো লাগল না। কোনো কালে সাদা রং করানো হয়েছিল। এখন জায়গায় জায়গায় সবজে শ্যাওলার ছোপ। বাড়ির সামনে কিছু আগাছার ঝোপ। ভেবে পেল না মাঠের মাঝখানে এই বাড়ি করার উদ্দেশ্যটা কী! জায়গাটাও স্যাঁতসেঁতে। এসেই যখন পড়েছে... দিনের আলো থাকতে থাকতে কয়েকটা ছবি তুলে নেওয়া যাক। আবীর মোবাইলের স্ক্রিনে চোখ লাগিয়ে বাড়ির পুরো একটা ছবি তুলল। এর পরেই বাড়িতে ঢোকার চওড়া সিঁড়ির ওপর চোখ পড়তে অবাক হল। একটা কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে আনমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। যেন কত কী চিন্তা করে চলেছে। মেয়েটা দেখতে খারাপ নয়। তার ওপর আধুনিকাদের মত কালো গেঞ্জি আর নীলচে জিনস পরে আছে। চিত্রকরের চোখে ছবিটা ভালই লাগল। মনের মধ্যে ছবির একটা ক্যাপশন তৈরী করে ফেলল সে। ধ্বংসাবশেষের ওপর নতুন প্রাণ!

বাড়িটাকে ছবিতে আরও জরাজীর্ণ করে সে আঁকবে। এবার মেয়েটার দিকে তাকাতে তার চোখে সে দেখল অসন্তোষের ছায়া! স্বাভাবিক, একা বসে থাকা সুন্দরী তরুণীর অজান্তে ছবি তোলা আপত্তিজনক ব্যাপার। আবীর ঠিক করল মেয়েটি যদি আপত্তি জানায়, সে ডিলিট করে দেবে। আবীর জিজ্ঞেস করার আগেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর সরু রাস্তা ধরে বাড়ির পিছন দিকে চলে গেল।

এখানে সন্ধ্যের অন্ধকারে আর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক মনে করল না আবীর। হয়তো পাশে কোথাও মেয়েটার বাড়ি। ডেকে লোক জড়ো করতে পারে! বেইজ্জত হতে কতক্ষণ? ও পা চালিয়ে বাইকের দিকে চলল। রাস্তায় উঠে বাইক স্টার্ট দেবার সময় পর্যন্ত কাউকে এগিয়ে আসতে দেখল না। তাহলে মেয়েটা কিছু মনে করেনি — তারই মনের ভুল। বাইক দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। কিন্তু মেয়েটার চোখে রাগের ভাষা ও ভুলতে পারল না। বাড়িতে এসে পৌঁছল আবীর। একটা ঝামেলা থেকে খুব জোর বাঁচা গেছে।

রাত্রে শোবার আগে ছবিটা দেখল। মনের কল্পনায় ক্যানভাস সাজাল। অস্বাভাবিক ভাবে মেয়েটার মুখ তাকে আকর্ষণ করছে। তাহলে কি সে প্রেমে পড়ে গেল? ব্যাঙ্কে টিফিনের সময় ইচ্ছে হল মেয়েটাকে একটু

দেখে। যেন খুব চেনা! মোবাইলের গ্যালারি খুলে ও চমকে উঠল। অবাস্তব ব্যাপার! পুরনো বাড়িটার ছবিতে সব কিছু আগের মতো আছে। শুধু চওড়া সিঁড়িতে বসে থাকা সুন্দরী মেয়েটা নেই। যেন রবার দিয়ে ওকে কেউ মুছে দিয়েছে! মনে হল একটু আগে বসে থাকা মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। দু'-তিনবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেও কোনো সমাধান করতে পারল না। আবীরের চোখে মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল। তার সামনে কেউ যেন বিরাট এক ধাঁধার বোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে। অফিসের কাউকে এই অবাস্তব কথা বলাও যায় না। এদিকে এই রহস্যময় কান্ড ওকে চিন্তার সাগরে ফেলে দিল। তাহলে কি মেয়েটাকে ছাড়াই ও ছবি তুলেছে? কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে ওর। কাল রাত্রেও তো মেয়েটার ছবি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেছে।

আবার মোবাইল খুলে গ্যালারি থেকে ছবিটা বার করে। নিশ্চুপ ভাঙা বাড়িটা শুধু দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে আছে। আবীরের মাথাটা ধোঁয়াশা হয়ে যাচ্ছে। অফিস কলিগ শ্রীমন্ত বলে উঠল, 'কী দেখছিস এত মনোযোগ দিয়ে? কোনো পর্নো ছবি?'

আবীর শুকনো হাসি হাসল, 'পর্নো হলে ভালো হত।'

আবীর চেয়ার ছেড়ে উঠে ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে আসে। কাজে মন বসে না। খালি মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে মেয়েটার ছবি। এমনকি ওর গায়ের কালো হাতকাটা গেঞ্জিটা পর্যন্ত চোখের সামনে ভেসে উঠছে! তাহলে সবই কি তার চোখের ভুল? কোনোরকমে কাজ সেরে বাড়ি ফিরল সে।

মা মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোর কী হয়েছে? কপালে চিন্তার রেখা! অফিসে কোনো ঝামেলা হয়নি তো?'

আবীর বুঝল, চিন্তার ছাপ নিশ্চয়ই তার চোখে-মুখে পড়েছে। মৃদু হেসে সে এড়িয়ে যায়।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে অত্যাশ্চর্য ঘটনার কথাটা ভেবে চলে আবীর। এর রহস্য যতক্ষণ না ভেদ হচ্ছে সে শান্তি পাবে না। দরকার পড়লে আবার সেই বাড়িটায় যাবে। যদি মেয়েটার দেখা পায়! ঘুমোবার আগে শেষবারের মত ফোনের গ্যালারি খোলে। পরক্ষণেই চমকে ওঠে! এই তো সেই মেয়েটা — আগের মতো সিঁড়ির চাতালে বসে আছে। চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে নিঃসন্দেহ হয়। তাহলে এতখানি সময় ছবি থেকে ও কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল? এটা কি তার মনের ভুল? তাহলে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য অন্য কাউকে ছবিটা দেখাবার প্রয়োজন। ভাবল উঠে মাকে ছবিটা দেখায়। কিন্তু সময় দেখল রাত সাড়ে এগারোটা। এত রাত্রে মামুলি একটা ছবি দেখাতে গেলে বাবা-মায়ের মনে অন্য সন্দেহ দেখা দেবে। ভাববে ছেলে নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছে ! ছবিটা জুম করে মেয়েটাকে দেখতে থাকল আবীর। বাদামি গায়ের রঙ। সরু ভ্রু দুটো যেন তুলি দিয়ে আঁকা। চোখ দুটো মাঝারি, কিন্তু মণি দুটো ঘন কালো। ঠোঁট চাপা, একটু মোটা ধরণের। মুখের সাথে মানানসই নাক। কালো টাইট গেঞ্জিতে বুকের গঠন পুরো বোঝা যাচ্ছে। পুরো ছবিটা মনের ক্যামেরায় তুলে ফেলল আবীর। তারপর মোবাইল অফ করে ঘুমিয়ে পড়ল। মেয়েটা ফিরে আসাতে যেন স্বস্তি পেল।

দ্বিতীয় পর্ব

কিন্তু সে একবারও গভীর ভাবে চিন্তা করল না মেয়েটা পুনরায় ছবিতে ফিরে এল কিভাবে? যদি তখনি এই চিন্তা করত, তাহলে এই কাহিনী হয়ত বেশি বড় হত না।

সকালে অফিস যাবার তাড়াতাড়িতে আবীরের মাথা থেকে ছবির কথা বেমালুম উধাও হয়ে গেছে। মা পর্ণা দেবী ছেলের মুখ স্বাভাবিক দেখে সন্তুষ্ট হলেন। অফিসে এসে আবীর ভাবল — আজ বাড়ি গিয়ে রং-তুলি নিয়ে বসতে হবে। ভাবনার সাথে সাথে ছবিটা ওর মস্তিষ্কে ধরা পড়ল। অফিসে এখনও বেশি কেউ আসেনি। ছবির সুন্দরী মেয়েটা ওর মনকে আকর্ষণ করতে লাগল। শরীরে এক উত্তেজনার ঢেউ খেলে গেল। মেয়েটা এখনও ছবির মধ্যে আছে তো? চিন্তাটা মাথার গভীরে কিলবিল করে উঠল। ফোন অন করে ছবি দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে পড়ল আবীর।

ছবি দেখেই মোবাইল ধরা হাতটা অল্প কেঁপে উঠল। গতকালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। মেয়েটা কর্পূরের মতো উবে গেছে! এই প্রথম ওর মনে ভয় ঢুকল। কেমন একটা গা ছমছমে অনুভূতি দেহে ছড়িয়ে পড়ল। বুদ্ধি দিয়েও এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না।

এই সময় অফিস কলিগ নীরা চেয়ারের পিছন থেকে বলে উঠল, 'অত মনোযোগ দিয়ে কী দেখছ?'

আবীর খেয়াল করেনি নীরাকে। তাই চমকে উঠল। আর একটু হলে হাত থেকে মোবাইলটা পড়েই যাচ্ছিল। নীরা আবীরের মুখ দেখে বলল, 'তোমার কি কিছু হয়েছে? মুখটা চকখড়ির মতো সাদা!'

নিজেকে সংযত করে আবীর। মুখে এক চিলতে হাসি ঝুলিয়ে রাখে, 'না না, তেমন কিছু নয়।' গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। নীরার কাছাকাছি থাকলে সে তার অস্বাভাবিকতা ধরে ফেলতে পারে। টয়লেটে যায় মুখে—চোখে জল দেবার জন্য। মাথা থেকে তাড়াতে চেষ্টা করে অদ্ভুত চিন্তাগুলো। নাহলে কাজে ভুল হয়ে যেতে পারে। স্থির করে নেয়, এই রহস্য যত শীঘ্র সম্ভব সমাধান করতে হবে। কিন্তু কিভাবে সেটা মাথায় এল না।

এক রাশ চিন্তা নিয়ে বাড়ি ফিরল সে। সবকিছু জট পাকিয়ে যাচ্ছে তার কাছে। রাত্রে শোবার আগে নতুন একটা চিন্তা মাথায় এল আবীরের। মেয়েটা জীবিত? না মৃতা? ঘটনা যেদিকে গড়াচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে ও মৃতা! ভয়টা পাকে পাকে জড়াতে শুরু করল তাকে। সত্যি মিথ্যে জানতে গেলে তাকে যেতে হবে ঘটনাস্থলে। মনস্থির করে নেয় আবীর। কাল সকালে অফিসের নাম করে বেরিয়ে ও যাবে আদিসপ্তগ্রামের ঐ ভাঙা বাড়িটায়। আশেপাশের লোককে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে মেয়েটার পরিচয়। কিন্তু মেয়েটাকে চেনাবে কী করে সবাইকে? কেননা সকালে মেয়েটা অদৃশ্য থাকে। আর রাত্রিবেলা ওখানে যাওয়া? অসম্ভব! আগে সকালে যাওয়া যাক, তারপর দেখা যাবে। চোখ বোজার আগে ফোনটা খুলল। এটা নেশার মতো হয়ে গেছে! একবার ওর ঐ সুন্দর মুখ দেখা চাই।

কিন্তু ফোন খুলে অবাক হয়ে গেল! মেয়েটা নেই। ও বিছানায় উঠে বসল। এই রকম তো হয় না! রাত্রে ফোন খুললে তার দেখা পাওয়া যায়! তাহলে কি রহস্য কাটল?

আচমকা হালকা পায়ের শব্দ ওর কানে এসে পৌঁছল। কেউ যেন লুকিয়ে-চুরিয়ে এগিয়ে আসছে। মোবাইলের স্টিল ছবিটা যেন ভিডিও হয়ে উঠেছে। পরিষ্কার সে দেখতে পাচ্ছে... ঝোপের জঙ্গলের মধ্যে থেকে মেয়েটা ধীর পায়ে বেরিয়ে আসছে। যেন একটা সাদা ধোঁয়ার কুন্ডলী! তারপর কালো গেঞ্জি পরা মেয়েটা সেই নির্ধারিত স্থানে এসে বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা আগের মতো স্থির হয়ে গেল। আবীরের ইন্দ্রিয়গুলো শিথিল হতে শুরু করল। মস্তিষ্কের গভীরে শিরা-উপশিরাগুলো ভয়ে নাচতে লাগল। ও যে কল্পনায় সবকিছু দেখছে না ভালভাবেই বুঝতে পারল। সেই জন্য মনের ভয়টা চতুর্গুণ বেড়ে গেল। হৃদপিন্ডের কাঁপুনি নিজের কানে শুনতে পাচ্ছে। হাতের মোবাইলটা যেন কিলবিল করছে মুঠোর মধ্যে। ওটাও যেন জ্যান্ত হয়ে গেছে। মোবাইলটা ছুঁড়ে বিছানায় ফেলে দিয়ে খাট ছেড়ে নেমে এল। ঘরের টিউবলাইটটা জ্বালাতে মনের ভয় একটা আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। বোতল থেকে কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করতে লাগল।

ফোনে যা দেখল কাউকে বলতে গেলে তার মাথার স্বাভাবিকতা নিয়ে প্রশ্ন এসে যাবে। মেয়েটা যে জীবন্ত নয় একটু আগেই সে জানতে পেরে গেছে। তবু কাল ওখানে যেতে হবে। পুরো ঘটনা ওকে জানতে হবে। ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত্রির বয়স ইতিমধ্যে অনেক বেড়ে গেছে। একটু ঘুমোতে হবে। অবশ্য জানে না ঘুম আসবে কি না!

তখনই তার মনের শিল্পী সত্তা জেগে উঠল। মেয়েটার একটা ছবি অতি সহজে সে এঁকে ফেলতে পারবে। তাহলে সেই ছবি দেখে কেউ না কেউ চিনবে। পত্রপাঠ বের করে ফেলল কাগজ-পেন্সিল। ঘরের এক কোণে রাখা ইজেলের কাছে গেল। তার মন জুড়ে রয়েছে মেয়েটির সুন্দর মুখখানা। মগ্ন হয়ে গেল ছবি আঁকায়। শেষ রাত্রির দিকে হুবহু মেয়েটাকে এঁকে ফেলল। ক্লান্ত শরীরটাকে এবার বিছানায় এনে ফেলল।

সকালের দিকে মাকে বলল, 'আজ অফিস যাব না। এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। বেলায় এসে খাওয়া-দাওয়া করব।'

মা-বাবা দু'জনেই লক্ষ করলেন আবীরের চোখ দুটো করমচার মতো লাল। দেখে মনে হবে রাত জাগার ফল। ওঁরা কিছু প্রশ্ন করার আগেই আবীর মোটর বাইকে স্টার্ট দিল।

কৌতূহলী মন নিয়ে জি টি রোড ধরে এগিয়ে চলল পুরনো, জীর্ণ একা দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িটার দিকে। যত এগিয়ে আসছে তত মনের মধ্যে চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দূরে চোখে পড়ছে দাঁত বার করা বাড়িটা। একটু আগে রাস্তার ধারে চোখে পড়ল গুমটি চায়ের দোকানটা। যদি কোনো খবর পাবার থাকে এটাই আদর্শ স্থান। দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। যেন চা-তেষ্টা পেয়েছে। সবে সাড়ে আটটা। শীতের আমেজ। হালকা সূর্যের আলোয় ভাল লাগছে। এক কাপ চা বানাতে বলল। বেঞ্চে দু'জন মাঝবয়সী লোক বসে আছে খবরের কাগজ নিয়ে। দোকানি ইয়ং ছেলে। আবীরের থেকে দু'-এক বছর কম বয়সী হবে। ও জানে কমবয়সী ছেলেরা এসব খবর রাখে। বিশেষ করে সুন্দরী মেয়েদের। মনে মনে একটা গল্প বানিয়ে রেখেছে আবীর। একটু অপেক্ষা করছে যদি দুটো খদ্দের কেটে পড়ে তাহলে কথা বলার সুবিধে। নাহলে এক্ষুণি পাঁচকান হবে।

স্পেশাল চা আর বিস্কুটের অর্ডার দেবার জন্যেই বোধহয় দোকানের মালিক খবরের কাগজ পড়া দু'জনকে বলে উঠল, 'কাকা, আমাকে এবার বেচাকেনা করতে দাও। কাগজ তো মুখস্থ হয়ে গেল।'

ওরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল। যাক, সুযোগটা অযাচিতভাবে এসে গেল।

'ভাই, দূরে যে ভাঙা বাড়িটা রয়েছে ওখানে লোক থাকে না?' আবীর তদন্তে নামল।

ছেলেটা চা তৈরী করতে করতে ওর দিকে তাকাল, 'আগে থাকত। এখন ভূতের বাড়ি।' ছোট্ট জবাব।

— 'ভূতের বাড়ি?' পায়ের ওপর পা তুলে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল সে।

— 'সেই রকমই অনেকটা। সাহাদের বাড়ি ছিল। ধান জমি, চাষবাসের ওপর নজর রাখার জন্য তৈরী করেছিল।' চায়ের কাপে চিনি গুলতে গুলতে বলল ছেলেটা।

— 'সব ছেড়েছুড়ে গেল কোথায়?'

— 'সবই কপাল। সাহাদের একমাত্র ছেলেকে সাপে কাটল। তারপরেই এই বনবাদাড় ছেড়ে একেবারে শ্রীরামপুর চলে গেল।'

আবীরের দিকে চা আর বিস্কুট এগিয়ে দিল ছেলেটা। মনমতো কথা এগোচ্ছে না। এখনই কোনো খদ্দের এসে গেলে বাধা পড়বে। জি টি রোড দিয়ে লরিগুলো বেশ দ্রুত গতিতে যাচ্ছে। গাড়ির শব্দের জন্যে কথাগুলো ভালো শোনা যাচ্ছে না।

— 'আপনার হঠাৎ বাড়িটার বিষয়ে এত ইন্টারেস্ট জাগল কেন ?' ছেলেটার রোগাটে মুখে কৌতূহল। আবীর একটু সাবধান হল।

— 'ভাবছিলাম, নিরিবিলি জায়গা। বন্ধুরা মিলে একদিন পিকনিক করতে আসব।' বিস্কুটে কামড় বসাল।

— 'ভুলেও অমন কাজ করবেন না। গত বছর ঐ বাড়ির সামনে একটা রেপ কেস হয়েছে। সকালে রক্তাক্ত মেয়েটাকে মরে পড়ে থাকতে দেখে আমরা পুলিশে খবর দিই। এখনও পর্যন্ত কোনো শালা ধরা পড়েনি।'

আবীর একটা সূত্র পেল। মুখে সুপ্ত উত্তেজনা দেখা দিল। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বলল — 'মেয়েটার কোথায় বাড়ি?'

— 'ব্যান্ডেলে।'

পকেট থেকে আঁকা ছবিটা বার করে ছেলেটাকে দেখাল। ছবি দেখে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল দোকানির ।

— 'হ্যাঁ এই তো, আপনি কি পুলিশের লোক?' ছেলেটার চোখে একটা ভয় ভয় ভাব।

চা শেষ করে উঠে দাঁড়ায় আবীর, 'না। আমার বোনের বান্ধবী ছিল ও। ছবি আঁকতে দিয়েছিল আমায়। শুনেছিলাম খারাপ খবরটা। ওর নাম ছিল পারমিতা।'

ইচ্ছে করে বানিয়ে নামটা বলল।

— 'ভুল বলছেন। মেয়েটার নাম ছিল অনিন্দিতা।' আবীরের চাল কাজে লেগে গেল। আসল নাম জানতে পারল।

— 'ঠিক ঠিক, অনিন্দিতা। কিন্তু এই বাড়িতেই ঐ নারকীয় ঘটনা ঘটেছিল জানতাম না। মনটা খারাপ হয়ে গেল।' পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বাইকে চড়ল।

এরপর তার কী করণীয়? এক অজানা বিপদের মাঝে সে পড়ে গেছে। কিভাবে বেরোবে এই ভৌতিক জাল থেকে? কপালে চিন্তার ভাঁজ। আর মনে আতঙ্কের কালো ছায়া !

তৃতীয় পর্ব

বাড়িতে ঢুকেই আবীর নতুন সমস্যায় পড়ল। দেখে মা বিছানায় শুয়ে। বাবা মায়ের পায়ে বরফ ঘষছে।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আবীর প্রশ্ন করল, 'কী হল?'

বাবা উত্তর দিলেন, 'তোর ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে চৌকাঠে হোঁচট লেগে এই কান্ড।' ও দেখল পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা বেশ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে।

— 'ভাঙেনি তো?'

মা বলে ওঠেন, 'তাহলে খুব যন্ত্রণা হত। তুই চিন্তিত হোস না। টেবিলে তোর জলখাবার রাখা আছে।' খাবার ইচ্ছেটা চলে গেছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ও টেবিলের দিকে এগোল।

বাবা বলে, 'হঠাৎ অফিস কামাই করলি? বন্ধুর বাড়িতে কিছু বিশেষ প্রয়োজন ছিল?' দায়সারা গোছের একটা জবাব দিল সে।

খানিক বাদে মা উঠে প্রায় নেংচে আবীরের ঘরে এলেন। ও তখন একমনে মোবাইলের ছবিতে খালি বাড়িটা দেখছে।

— 'তুমি আবার ঐ পায়ে এক্ষুণি হাঁটাহাঁটি করছ কেন?'

— 'শুয়ে থাকলে চলবে আমার?' খাটে আবীরের পাশে বসলেন মা। ছেলের পিঠে হাত রেখে বললেন।

— 'দেখ আবীর, আমি তোর মা। আমাকে কিছু লুকোস না। কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছি তুই কোনো ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত। আমাকে খুলে বল।'

আবীর একবার ভাবল বলে দেয় ঐ অদ্ভুত ছবির কথা! কিন্তু নিজেকে সামলে নেয়। সে জানে মা এইসব ভূত-প্রেত তন্ত্র-মন্ত্র খুব বিশ্বাস করে। তাছাড়া একটু আগে হোঁচট খেয়েছে। ভাববে এসব মেয়েটার বিদেহী আত্মার কারসাজি।

— 'তুমি অহেতুক ভাবছ। সেরকম কিছু হলে আগে তোমাকেই বলব। আমি বরং ভাবছি তোমার পায়ের একবার এক্স রে করে নিয়ে আসি।'

— 'দরকার হবে না।' পর্ণা দেবীর মুখে তবু চিন্তার ভাঁজ। আবীর সেটা লক্ষ্য করল।

— 'এখনও কী চিন্তা করছ?' হেসে বলে সে।

— 'একটা কথা বলব ? জানি তুই হাসবি।'

— 'হাসব কেন?'

— 'সকালে তোর ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় একটা পচা দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগে। ভাবলাম কোনো টিকটিকি মরেছে তাই এসে ঢুকেছিলাম।'

মায়ের কথা শুনে আবীরের চোখে সুপ্ত উত্তেজনা তৈরি হল।

পর্ণা দেবী বললেন, 'আচমকা কেউ যেন আমায় ধাক্কা মারল।' তাঁর কণ্ঠে ভয়ের স্পর্শ, 'তোর বাবাকে এ কথা বলতে পারিনি। এখনই হাসবে। সত্যি বলছি তোকে, এতটুকু বানিয়ে বলছি না।'

আবীরের বুকে একটা হিমেল বাতাসের স্রোত বয়ে গেল। হারানো সূত্রগুলো যেন একে একে এসে জড়ো হচ্ছে। তার মনের সাহস একটু একটু করে কমছে। কয়েকদিনের ঘটনা এখন মাকে বলা মানে... এদিকে আর কিছু সময় বাদে নতুন একটি রাত্রের মুখোমুখি হতে হবে তাকে। একেবারে একলা! এখনও সে তেমন ভাবে ভেঙে পড়েনি। কিন্তু মায়ের কথা শুনে তার স্নায়ুগুলো ভেঙে চুরে যেতে কতক্ষণ?

— 'আ-আমার মনে হয় তুমি ভুল করছ। সকালবেলায় তোমায় কে ঠেলে ফেলে দেবে?'

আবীর কথাটা বলল বটে কিন্তু তার গলায় শক্তির অভাব।

সেদিন রাত্রে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের ঘরে ঢুকল আবীর। অন্য ঘরে শুতে চাইলে আগে মা-ই সন্দেহ করত। ঘরের দরজা বন্ধ করতেই মনে হল বাইরের জগৎ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ঘরের লাইট বন্ধ করতে গিয়েও থেমে গেল। অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করতে মন সায় দিল না। ধীর পায়ে খাটে এসে বসল। ফোনটা হাতে নিতেই মনে হল ঠান্ডা একটা অজগর সাপ ছুঁয়ে ফেলেছে। বুঝতে পারছে তার বুকের সাহস এরই মধ্যে তলানিতে ঠেকেছে! ঠাকুরকে স্মরণ করল। এরপর যেন কোনো বিভীষিকার সে সম্মুখীন না হয়! তাহলে তার মোকাবিলা সে করতে পারবে না। আবীর বিছানায় বসে রইল। মাথার গভীরে উদ্ভট দৃশ্যগুলো জোর করে টেনে এনে তার চোখের সামনে কেউ মেলে ধরছে। আসলে কোনো অদৃশ্য শক্তি তাকে ক্রমশ দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। বাইরের ঠান্ডার থেকে ঘরের মধ্যের শীতলতা যেন কয়েকগুণ বেশি। এই সময় ইজেলের দিকে চোখ পড়ল। ভয়ার্ত বিস্ময়ে দেখল আঁকার স্ট্যান্ডে আটকানো রয়েছে অনিন্দিতার ছবি! এই ছবি তো সে নিজের হাতে কাল এঁকেছিল। অসম্ভব! এ কীভাবে হতে পারে! ছবিটা তো নিচতলায় তার ব্যাগের মধ্যে আছে। অথচ তার অজান্তে ছবিটা এখানে এল কীভাবে? বুদ্ধি ক্রমশ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। তবে কি মৃতা অনিন্দিতার আবির্ভাব ঘটছে? কথাটা মনে হতেই আবীরের হৃদপিন্ডটা দ্রুত তালে চলতে শুরু করল।

ছবির দিকে সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইল। পেন্সিল দিয়ে সাদা কাগজে আঁকা ছবিতে আস্তে আস্তে রং ধরছে! শুধু মুখমণ্ডলের জায়গায় নতুন করে হাত পা গজাচ্ছে! ফিরে আসছে কালো গেঞ্জি পরা অনিন্দিতা। আবীর ভাবছে কতক্ষণ এই দৃশ্য বসে বসে সে দেখতে পারবে? আলো ভর্তি ঘরে এক অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছে। আবীরের সারা দেহ যেন বরফের মতো জমাট বেঁধে গেছে। হাত-পা সব পাথরে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। নড়াচড়ার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত ও হারিয়ে ফেলেছে।

মোবাইলে রাখা ছবিটা পুরোপুরি ছবি আঁকা স্ট্যান্ডে এসে গেছে। আবীরের চোখ সতর্ক হল। মেয়েটা অল্প অল্প নড়ছে। যে কোনো মুহূর্তে ছবি থেকে বেরিয়ে আসবে। আবীরের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে বিপদের সতর্কতা জানাল। অনিন্দিতা একটা পা মেঝেতে রাখার সঙ্গে সঙ্গে আবীর বিকট আর্তনাদ করে উঠল। সেই ভয়ার্ত আর্তনাদ পাশের ঘরে শুয়ে থাকা পর্ণা দেবীর কানে পৌঁছল।

দরজা ধাক্কার শব্দে আবীর যেন বাস্তবে ফিরে এল। কোনো রকমে উঠে দরজা খুলে দিল। ওর বাবা-মা ছেলেকে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। আবীরের মুখটা যেন একটা ভয়ের মুখোশ হয়ে গেছে! অত বড় ছেলে বাচ্চার মতো মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাবা-মা দুজনে ধরে ওকে নিজেদের ঘরে নিয়ে গেলেন। আবীরের মুখ দিয়ে গোঙানি ছাড়া কিছু বেরোচ্ছে না।

ওঁরা বুঝতে পারছেন, কোনো কারণে অত্যধিক ভয় পেয়েছে আবীর। ও স্বাভাবিক না হলে কিছু জানা যাবে না। জল খেয়ে খানিকটা ধাতস্থ হল আবীর। ও দেখল আর লুকিয়ে লাভ হবে না। কেননা এই কয়েক দিনে অনিন্দিতার আত্মা শক্তি বাড়িয়ে নিয়েছে। মোবাইলের মধ্যে যে ছিল আবদ্ধ সে এখন বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এরপর আরও কতখানি অগ্রসর হবে জানা নেই।

ঠান্ডার কাঁপুনি এখনও শরীর থেকে দূর হয়নি। সেই অবস্থাতেই ও পুরো ঘটনাটা বলল। সব শুনে পর্ণা দেবীর বুকটা আতঙ্কে হিম হয়ে উঠল। মাঝরাত্রে চারিদিকে একটা ভয়ের থমথমে ভাব। বাবা শ্যামলবাবুর মনেও কিছুটা অস্বস্তি দেখা দিল। তবু কিছুটা অবিশ্বাস এখনও মনে রয়েছে।

তিনি বললেন, 'তুই মায়ের সঙ্গে এখানে শুয়ে পড়। আমি তোর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ছি।'

পর্ণাদেবী বাধা দিলেন, 'তুমি বেশি সাহস দেখিও না। অবিশ্বাস সব ক্ষেত্রে ভালো নয়। আমিও আজ সকালে এইরকম কিছু আন্দাজ করেছিলাম।'

— 'অন্তত ওর ঘরের আলোটা অফ করে দিয়ে আসি।'

আবীর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই পাশের ঘরে উনি চলে গেলেন। মা ও ছেলে কান খাড়া করে রইল। ওরা কি নতুন কোনো বিপদের আশঙ্কা করছে?

শ্যামলবাবুর মনেও একটা সন্দেহ দানা বেঁধেছে। আবীরের ঘরে ঢুকতে সতর্কতা অবলম্বন করলেন। মন বড়ই অদ্ভুত বস্তু। কখন নিজের অগোচরে ভয় জিনিসটা ঢুকে পড়ে বোঝা যায় না। আলো জ্বলা ঘরে ঢুকতেই শ্যামলবাবুর চোখের সামনে দিয়ে কেউ যেন সাঁৎ করে আলমারির আড়ালে লুকোল। থমকে গেলেন উনি। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। তবে কি তাঁর মনেও বিকার ঢুকে গেছে?

সন্তর্পণে এগিয়ে এসে আলমারির পাশটা দেখলেন। নেই... কেউ নেই। বিলকুল ফাঁকা। ছবি আঁকার স্ট্যান্ডে কোনো ছবি দেখতে পেলেন না। বিছানায় পড়ে থাকা ছেলের মোবাইলটা তুলে নিয়ে গ্যালারিটা দেখতে গিয়ে শরীরে এক শিহরণ খেলে গেল! মনে হল তার পিছনে কেউ দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে ছবিটা দেখার চেষ্টা করছে। মাথা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন।

ফাঁকা ঘরে তিনি একাকী দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছেন অন্য কারো উপস্থিতি। যে এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। বুকের স্পন্দন ইতিমধ্যে দ্রুততর হয়েছে। ফোনটা রেখে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। এমনকি আলোটা পর্যন্ত নেভাতে ভুলে গেলেন।

এরপর তিনজনে মিলে ঘরে বসে অপেক্ষা করে চলল ভোরের জন্যে। ছোটখাটো খুটখাট শব্দও বুকের মাঝে শিহরণের ঢেউ তুলছে। পর্ণা দেবী মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপ করে চলেছেন।

আবীর বলল, 'আমার ব্যাঙ্কের এক কাস্টমার চন্দন লাহিড়ীর মামা রুদ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কামাখ্যার একজন নামকরা তান্ত্রিক। চন্দনদার মুখে শুনেছিলাম ওর মেয়েকে এইরকম বিপদ থেকে মামা বাঁচিয়েছিলেন।[১] আমি কাল সকালেই ওঁকে ফোন করব। নিশ্চয়ই কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে।

চতুর্থ পর্ব

সারা রাত জেগে তিনজনেই ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পর্ণা দেবীর ঘুম ভাঙল সকাল সাতটায়। দেখল পাশেই বাপ আর ছেলে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলেন তিনি। শ্যামলবাবু আজ বাদে কাল রিটায়ার করবেন। তাই জমানো ছুটিগুলো নিয়ে প্রায় এক মাস হল বাড়িতে বসে আছেন। ছেলেও বোধহয় অফিস যাবে না। মুখে ব্রাশ দিয়ে কিচেনের দরজাটা খুলতেই রাতের ভয়টা ফিরে এল।

বাস্কেটে রাখা এঁটোকাঁটা সারা মেঝেতে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। দরজা-জানলা বন্ধ অবস্থায় বিড়াল ঢোকার প্রশ্ন আসে না। তবে? কে এসব করল? তাহলে কি আবীরের বাবা রাত্রে নিচে নেমেছিলেন? এর মধ্যে শ্যামলবাবুও নিচে নেমে এসেছেন।

'এসব আবার কে করল?' বিস্ময়ে হতবাক তিনি। পর্ণাদেবীর দু'চোখ জুড়ে ভয় কিলবিল করছে। কর্তা-গিন্নি দুজনেই বিস্ফারিত চোখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

— 'আমার খুব ভয় করছে। না জানি আরও কী কী বিপদ অপেক্ষা করে আছে!' পর্ণাদেবীর গলা কাঁপছে। শ্যামলবাবু উত্তর দেওয়ার মতো কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। বন্ধ ঘরে এসব কান্ড কে ঘটাবে?

ইঁদুর বা ছুঁচো আসাও সম্ভব নয়। কেননা নর্দমায় জালতি দেওয়া আছে।

— 'আবীর ঘুম থেকে উঠলে ওর চন্দনদাকে ফোন করতে বলছি।' অন্যমনস্ক ভাবে বলেন শ্যামলবাবু, 'এসব কথা পাড়ায় রটলেও মুশকিল। এখুনি সব আসবে মজা দেখার জন্য।'

এই সময় আবীর নেমে এল। সবকিছু দেখে শুনে আর অপেক্ষা না করে চন্দন মিত্রকে ফোন করল। ফোনটা স্পিকারে রাখল যাতে বাবা-মাও শুনতে পান।

— 'কী ব্যাপার, সাতসকালে ব্যাঙ্কবাবু যে!'

— 'দাদা, তোমায় একটু বিরক্ত করছি। তোমার একটু সাহায্যের প্রয়োজন।' এরপর আবীর পুরো ঘটনা সংক্ষেপে বলে যায়।

— 'খুব সাংঘাতিক ব্যাপার। আমার নিজের জীবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এমনই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম। রুদ্র মামা না থাকলে কী যে হত! তোমার কপাল ভালো। মামা এখন এখানেই আছেন। আগামী সপ্তাহে গৌহাটি ফিরে যাবেন। তোমার বাড়ির ঠিকানাটা দাও।'

— 'চন্দনদা, যেমন করে পারো ওঁকে নিয়ে এসো। আর প্লিজ় ব্যাঙ্কে কিছু জানিও না।'

— 'এসব কথা কেউ জানবে না। তবে মনে হয় আজ হবে না। এক যজমানের বাড়িতে যজ্ঞের কাজে মামা ব্যস্ত থাকবেন। তবু মামাকে ঘটনাটা জানাচ্ছি। পরে ফোন করছি। ভয় পাবে না। মামা বলেন ঐসব অতীন্দ্রিয় শক্তিকে যত ভয় পাবে, তত ক্ষতি করার শক্তি ওদের বৃদ্ধি পায়।'

ওপ্রান্ত থেকে লাইন কাটার শব্দ এল।

তিনজনের মুখে আগামী বিভীষিকার ছায়া। পর্ণা দেবী রান্নাঘর পরিষ্কার করে স্নান করতে বাথরুমে গেলেন। এমনিতেই বেলা হয়ে গেছে। রাজ্যের সব কাজ পড়ে আছে — কিন্তু কাজ করার শক্তিটাই হারিয়ে গেছে। আবীর চা খেয়ে ব্যাগ থেকে আঁকা ছবিটা বার করল। একই ছবি যেমনটি ও এঁকেছিল! তাহলে কি ও কল্পনায় ঐসব ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখল? মনের মাঝে সত্যি-মিথ্যের আলোড়ন। শ্যামলবাবুর মনে পড়ছে রাত্রে আবীরের ঘরে কারুর অদৃশ্য উপস্থিতির কথা। এই রকম উপলব্ধি কোনোদিন হয়নি জীবনে। পর্ণা দেবী পুজো করতে করতে ভাবছেন, কালকে কেউ যেন ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিল! প্রত্যেকেই অলৌকিক শক্তির উপস্থিতি উড়িয়ে দিতে পারছে না।

কয়েক ঘন্টা বাদে আবীরের ফোন বেজে উঠল। চন্দনদা ফোন করছে।

— 'হ্যাঁ বলো দাদা।'

— 'তোমরা তিনজনেই একসঙ্গে আছো নিশ্চয়ই। মামা কিছু কথা তোমাদের বলবেন।'

আবীর সঙ্গে সঙ্গে ওদের ডেকে নিয়ে স্পিকার অন করল। ফোনের ও প্রান্ত থেকে একটা গম্ভীর গলা ভেসে এল।

— 'আমি রুদ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলছি। তোমরা হয়তো ভাবছো আমি কোনো জটাধারী হাতে ত্রিশূল গলায় রুদ্রাক্ষ কপালে রক্ত তিলকধারী তান্ত্রিক! কাল যখন তোমাদের বাড়ি যাব তখন ভুল ভাঙব। তোমাদের মতোই সাধারণ মানুষ আমি। মায়ের পুজো আর জপতপে আমার সময় কাটে। চেষ্টা করি তারা মায়ের সাহায্যে মানুষের কিছু উপকার করতে। দেখো, আমি তন্ত্র গ্রন্থ পড়েছি। মারণ, উচাটন, বশীকরণ — এই তিন ক্রিয়া মূলত অভিচার হিসেবে উল্লেখ আছে সেখানে। তলিয়ে দেখলে তিনটি ক্রিয়াই মারাত্মক অপরাধমূলক। একটিতে হত্যা, আরেকটিতে পীড়ন ও শেষেরটিতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করানোর হুমকি। তিনটে জিনিসকেই আমি মন থেকে মেনে নিতে পারি না। তাই আমাকে তান্ত্রিক ভাবার কোনো কারণ নেই।'

রুদ্রনাথের গম্ভীর কণ্ঠস্বর তাদের মন্ত্রমুগ্ধের মতো আকর্ষণ করতে থাকে।

— 'আমাদের প্রত্যেকের মনের গভীরে দুটো শক্তি কাজ করে। পজ়েটিভ আর নেগেটিভ। পজেটিভ হল ঈশ্বর চিন্তা। আর নেগেটিভ হল ভূত-প্রেত প্রভৃতি। অবশ্য এটা আমার ধারণা। প্রেত বা পিশাচ নেগেটিভ এনার্জি। চন্দনের মুখে যা শুনলাম তাতে এই মুহূর্তে তোমাদের মনে নেগেটিভ শক্তির আধিক্য। তাই অশুভ

শক্তি সহজে তোমাদের ঘিরে ফেলেছে। এর থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে কী কী করতে হবে মন দিয়ে শোনো।' উনি একটু থামলেন। তিনজনে কান খাড়া করে আছে।

— 'তোমরা সকলে শুদ্ধভাবে থাকবে। পরিষ্কার কাচা জামাকাপড় পরবে। বাথরুম থেকে বেরোনোর সময় ভালো করে পা ধোবে। রাত্রে বাথরুমে গেলে একা একা আলো না জ্বালিয়ে চলে যাবে না। বাড়ির ঘরদালানে গঙ্গাজল ছিটিয়ে রাখবে। ধুনো পোড়াবে। এঁটো বাসন জল দিয়ে অন্তত ধুয়ে রাখবে। বাস্কেটে অভুক্ত খাবার ফেললে ভালো করে এঁটে চাপা দিয়ে রাখবে। গায়ত্রী মন্ত্র বা যে কোনো ঠাকুরের নাম জপ করবে। যে তোমাদের দেখা দিচ্ছে তার ছবি বা ফটো বাড়িতে রাখবে না। ফোন থেকে ঐ ছবি এখনই ডিলিট করে দাও। যে ছবি এঁকেছ বাড়ির বাইরে গিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দাও। বুঝতে পারছি তোমাদের বাড়িতে প্রেতের প্রবেশ ঘটেছে। ঐ বিষয় নিয়ে বাড়ির মধ্যে কোনো আলোচনা করবে না। কেননা ওরা কান খাড়া করে রাখে। ওদের নিয়ে আলোচনাতে ওরা খুশি হয়। আজ রাত্রে বিশেষ ঘরটাতে শোবে না। তিনজনে একসঙ্গে ঘুমোবে। রাতে তোমাদের ঐ অতৃপ্ত আত্মা নানাভাবে আকর্ষণ করবে। যদি মনে হয় আজ রাত্রিটা অন্য কোথাও কাটাতে পারো। তবে যেগুলো বললাম এখন থেকে পালন করলে প্রেতের শক্তি কিছুটা হ্রাস পাবে। কাল সকালে আমি চন্দনকে নিয়ে যাব। ভালো কথা, আজ নিরামিষ খেয়ো। জয় তারা।' অপর প্রান্ত নীরব হল।

রুদ্রমামার কথা শুনে ওদের মনে অল্প অল্প করে সাহস ফিরে এল। আবীর ব্যাগ থেকে ছবি বার করে পোড়াতে ছুটল। তারপর এসে মোবাইল থেকে ফটো ডিলিট করে দিল। যেন মনে খানিকটা সাহস ফিরে এল। পর্ণা দেবী অক্ষরে অক্ষরে কথাগুলো পালন করতে থাকলেন। রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি বলে দুপুরে একই ঘরে তিনজনে শুয়ে পড়ল। কিন্তু বিকাল হতে পুরনো ভয় ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে ওদের সামনে এগিয়ে আসতে লাগল।

পর্ণাদেবী একবার বললেন, 'আজ রাতটা কোনো হোটেলে গিয়ে কাটিয়ে দিই।'

শ্যামলবাবু বলে ওঠেন, 'বাড়ি ফাঁকা রেখে গেলে চোর চুরি করতে ছাড়বে না। তাছাড়া রুদ্রবাবু তো কালই আসবেন।'

আবীরও বাবার কথায় সহমত জানাল। কাজের লোক বিকালে কাজ করে চলে গেল। পর্ণা দেবী সন্ধ্যে দিয়ে এসে রান্না চাপালেন। বাকি দুজন ডাইনিং রুমের চেয়ারে চুপ করে বসে আছে। যেন কারো আসার প্রতীক্ষায়। আবীর মন থেকে যতই অনিন্দিতার কথা ভোলার চেষ্টা করছে, কেউ যেন জোর করে ওর মগজে অনিন্দিতার মুখের ছবি ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আচমকা ওপরে আবীরের ঘরে কিছু পড়ে যাবার শব্দ হল। পর্ণা পর্যন্ত কিচেন থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন বাবা আর ছেলে ভয় চকিত চোখে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। পর্ণা বুঝে গেলেন ব্যাপারটা। তিনিও আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

'বলেছিলাম তোমাদের, একটা রাত হোটেলে কাটিয়ে দাও। এখনও সারা রাত্রি পড়ে আছে। এবার না আমি হার্টফেল করে ফেলি!'

'....শ...শ...শ...শ!' শ্যামলবাবু ঠোঁটে আঙুল চাপলেন। পর্ণার কানে রুদ্রনাথের কথাগুলো বেজে উঠল। বাড়িতে বসে ওদের আলোচনা একদম করবে না। ওদের কান খুব সতর্ক। এই সময় ওপরের ঘরের মেঝেতে ঠকঠক করে আওয়াজ হতে শুরু করল। কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুকছে! শীতের জন্য জানলাগুলো সব বন্ধ। ওদের নাকে একটা পোড়া গন্ধ এসে ঢুকল। পর্ণা কিচেনে গিয়ে দেখেন কড়ায় বসানো তরকারিটা পুড়ে কালো হয়ে গেছে। গ্যাসটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলেন। আবার নতুন করে রান্না চড়াতে হবে। এদিকে মেঝেতে পেরেক ঠোকার শব্দ ক্রমাগত হয়ে চলেছে। ভয়ে, রাগে, দুঃখে পর্ণা আর নিজেকে সংযত করতে পারলেন না। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

আবীর এসে মাকে জড়িয়ে ধরল, 'কেঁদো না। আমরা যত ভয় পাব ওদের তত বেশি শক্তি বৃদ্ধি হবে। আর রান্না চাপাতে হবে না। আজ রুটি আর মিষ্টি খেয়ে নেব। চলো টিভি চালিয়ে দিচ্ছি। মনটা অন্যদিকে

থাকবে।’ ড্রয়িংরুমে এসে আবীর আস্থা চ্যানেলটা চালাল। ভজন হচ্ছে। ভলিউমটা বাড়িয়ে দিল। একটু বাদেই ওপরে হাতুড়ির শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। ওরা মুখ তাকাতাকি করল।

রাত্রে ওপরের ঘরে শুতে যেতেও কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে। আবীর ভাবে কী কুক্ষণে ঐ ভাঙা বাড়িতে গিয়েছিল! পর্ণা দেবী আবার কিছু ধুনো জ্বালালেন। সবে সাড়ে সাতটা বাজে। মনে হচ্ছে পাড়া থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। শীতটাও যেন আজ বেশি লাগছে।

পর্ণা দেবী বললেন, ‘তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে ওপরের ঘরে চলে যাব। ভগবান আছে, তিনি রক্ষা করবেন।’ সবাই বুঝল মনের ভয় তাড়াতে কথাগুলো বলা।

অন্তিম পর্ব

রাত্রে তিনজনে একসঙ্গে শুয়ে পড়ল। সবে ঘড়িতে দশটা বেজেছে। শীতের রাত, চারিদিকে নিশ্চুপ। এমনিতেই পাড়াটা নিরিবিলি। ওদের কারোর চোখে ঘুম নেই। কান পড়ে আছে পাশের ঘরের দিকে। একটু বাদে কানে এল পাশের ঘর থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ। কেউ অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতর স্বরে এক টানা কেঁদে চলেছে।

তিনজনের বুক ভয়ে হিম হয়ে এল। পর্ণা বিড়বিড় করে বিপত্তারিণীর নাম জপ করতে লাগল। আবীর বিছানায় উঠে বসল।

ওর বাবা বলে উঠলেন, ‘উঠলি কেন?’

— ‘টয়লেটে যাব।’

পর্ণা বিরক্তির স্বরে বলে ওঠেন, ‘এই তো এসে শুলি, এর মধ্যে...’ আসলে দরজা খুলে যেতে হবে। বাইরে ভয়ঙ্কর আত্মা কোথায় ঘাপটি মেরে বসে আছে কে জানে!

শ্যামলবাবু উঠে দাঁড়ালেন, ‘চল, আমি দাঁড়াচ্ছি।’ আবীরের মনে হল যেন সে বাচ্চা ছেলে ।

‘দাঁড়াতে হবে না। দরজা খুলে রেখে যাচ্ছি।’ আবীর বাইরে বেরিয়ে বাথরুমের আলো জ্বালাল। কৌতূহলবশত ওর ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। তখনি ওর চোখে পড়ল আবছা একটা ছায়া! অবিকল এক নারীমূর্তি। ছায়ামূর্তিটা অল্প অল্প দুলছে। ওর বুকের মধ্যে ভয়াল ভয়ঙ্কর অনুভুতিটা জাগ্রত হয়ে স্নায়ুগুলোকে অকেজো করে দিল। ও সহ্য করতে পারল না। কেননা ইতিমধ্যে মূর্তিটা বাতাসে ভর দিয়ে ওর কাছাকাছি এসে গেছে। এক ঝলক হিমেল বাতাস আবীরের সারা অঙ্গে হাত বুলিয়ে দিল। জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগে বুঝতে পারল বাবার শক্ত দুটো হাত ওকে ধরে ফেলল।

শ্যামলবাবু কোনোরকমে ছেলেকে ধরে খাটে এনে শুইয়ে দিলেন। সারা রাত এ ভাবে কাটল। আবীর মাঝে মাঝেই চেতনা হারিয়ে ফেলছিল। পর্ণা কাঁদো কাঁদো মুখে সারা রাত ঠাকুরের নাম করে চললেন। শ্যামলবাবু কথা হারিয়ে মোমের পুতুল হয়ে গেছেন। কারণ আবীরের জ্ঞান যখনই ফিরেছে ওঁরা আবীরের মুখে দেখেছেন গভীর আতঙ্কের ছায়া। বিড়বিড় করে ভুল বকছে। মা-বাবা দুজনেই ভাবছেন কখন এই কালরাত্রির অবসান ঘটবে! অবশেষে পুব আকাশে রং ধরল। দু’-একটা পাখির ডাক কানে আসতে লাগল। সময় জানিয়ে দিল ভোরের বার্তা।

সকালে চন্দন ফোন করল। আবীর এখনও ততটা সুস্থ হয় নি। তাই শ্যামলবাবু ফোন ধরলেন। ছেলের কাল রাতের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন।

‘আমরা সন্ধ্যে নাগাদ আপনার বাড়ি পৌঁছে যাব। কারণ মামা বলেছেন যা করার, তা সূর্য অস্ত যাওয়ার পর করতে হবে। বাড়িতে শুধু আপনারা তিনজনই থাকবেন। লোক জানাজানি যেন না হয়। এখন রাখছি।’

সন্ধ্যেবেলা চন্দন মিত্র নিজে ড্রাইভ করে তার রুদ্রমামাকে নিয়ে এল। আবীর ততক্ষণে সুস্থ হয়ে উঠেছে।

রুদ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে দেখে প্রথমেই যার চেহারা মনে ভেসে ওঠে সে হল অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ঐরকম লম্বা, ফর্সা গায়ের রং। মুখ-চোখ এক ধাঁচের। শুধু কণ্ঠস্বরটা আরও গম্ভীর। পরণে লম্বা গেরুয়া পাঞ্জাবি, তার ওপর ঠান্ডার জন্য একটা কালচে জহর কোট। সাদা পাজামা। লম্বা কাঁধ পর্যন্ত কাঁচা-পাকা চুল। দেখলে মনে একটা শ্রদ্ধা আসে। বয়স আন্দাজ করা মুশকিল। পঞ্চান্নও হতে পারে, আবার পঁয়ষট্টিও হতে পারে। তবে শক্তসমর্থ চেহারা।

ঘরে ঢুকে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন তিনি।

'কী, আমাকে দেখে তান্ত্রিক বলে মনে হচ্ছে?' অল্প রসিকতার ছাপ তাঁর কণ্ঠে। ওরা দুজনকেই আপ্যায়িত করল। পর্ণা দেবী উঠলেন কিচেনে যাওয়ার জন্য।

'শুধু এক কাপ লিকার চা। চিনি কম। কাজের আগে সাধারণত আমি কিছু খাই না।' রুদ্রনাথ বললেন।

চন্দন আবীরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি দেখছি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছ।'

আবীর অনিন্দিতার বিষয়ে মুখ খুলতেই রুদ্র বাধা দিলেন, 'খেয়াল রেখো, আমাদের সব কথাবার্তা ওপরে বসে কান পেতে সে শুনছে।'

আবীর ঢোঁক গিলে ফেলল। পর্ণা দেবী চা নিয়ে এলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে রুদ্রনাথ বললেন, 'বাইরে থেকে বুঝেছি বাড়িটা দোতলা। সাধারণত এরা ওপর মহলটাই পছন্দ করে। তাই তোমার ঘরে বসেই আমাদের কাজ করতে হবে।' তারপর পর্ণার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এক ঘটি গঙ্গা জল, কিছু ধুনো, কয়েকটা ধূপ আর একটু কর্পূর আমার লাগবে।'

শ্যামলবাবু বললেন, 'আপনি নিশ্চিত, এইরকম কিছুর আবির্ভাব ঘটেছে?'

— 'দেখুন আমি নিজেকে মনস্তাত্ত্বিক হিসেবে পরিচয় দিই। আমার মন আমাকে জানিয়ে দেয় নেগেটিভ এনার্জির উপস্থিতি। এত বছর এইসব নিয়ে ঘষামাজা করে আরও অভিজ্ঞতা বেড়েছে। ওদের গন্ধ আমি পাই।'

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে কাঁধে ঝোলার মতো ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'ওপরের ঘরে আমি আর আবীর শুধু যাব। আপনারা এখানেই থাকুন। ওকেও কিছু সময় বাদে নিচে পাঠিয়ে দেব। কেননা আমি চাই না ঐ ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলো আপনাদের মনে স্মৃতি হয়ে থাকুক।'

রুদ্রনাথের কথাগুলো একটা ভয়ের রেশ নিয়ে ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আবীর আর রুদ্রনাথ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল। দরজার সামনে কথামতো ধূপ, ধুনো, গঙ্গাজল সাজানো ছিল। দরজা খুলতেই একটা বোঁটকা গন্ধ আবীরের নাকে এসে লাগল। রুদ্রনাথের কথামতো আবীর ঘরের আলোটা জ্বালাল। কিন্তু টিউবলাইটটা দপদপ করতে লাগল। স্টার্টারটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। ষাট পাওয়ারের বাল্ব জ্বালিয়ে দিল আবীর।

রুদ্রনাথ ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি নির্ভয়ে থাকো। আমি সঙ্গে আছি।'

সারা ঘরে গঙ্গা জল ছেটাতে গন্ধটা একটু কমল। ছবি আঁকার স্ট্যান্ডের সামনে রুদ্রনাথ মাটিতে বসে ওকেও বসার ইঙ্গিত করলেন। ধুনো জ্বালিয়ে তার মধ্যে কর্পূর ফেলে দিলেন। ধূপগুলো জ্বালিয়ে দিলেন। এবার পদ্মাসনে বসে চোখ বুজলেন। তার আগে আবীরকে পুনরায় সতর্ক করে দিলেন, 'যাই দেখো না কেন, ভীত হবে না। তোমাকে ও কিছু করতে পারবে না।'

আবীরের মনে সতর্কবাণী আরও ভয়ের রেশ ছড়িয়ে দিল। কোনো মারাত্মক ঘটনা ঘটার অপেক্ষায় দুরুদুরু বুকে সে বসে রইল। চোখের পলক ফেলতেও ভয় লাগছে। চন্দনের মামা নিশ্চল হয়ে বসে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে চলেছেন। যেন কোনো সাধক মায়ের পূজায় নিমগ্ন। বদ্ধ ঘরে ধূপ ধুনো কর্পূরের ধোঁয়ায় শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে আবীরের। একটা ক্ষীণ চাপা শব্দ ঘরের কোণ থেকে ভেসে এল। আবীর শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ঘরের উত্তর কোণটার দিকে তাকাল। হলদেটে আলোয় দেখল কোণটা কালো ঝুলে ভর্তি! ভেবে পেল না এক দিনে এত ঝুল এল কোত্থেকে? ঐ ঝুলের জাল ভেদ করে অনিন্দিতার মুখটা দেখা যাচ্ছে! এখন আর

সেই সুন্দর মুখ নেই। বরং এক কদাকার রক্তমাখা মুখমন্ডল যা যে কোনো সাহসী মানুষের হৃদপিন্ড বিকল করে দিতে পারে।

চোখ বোজা রুদ্রনাথ মনে হয় আবীরের মনের আতঙ্ক উপলব্ধি করতে পারলেন। কেননা সেই মুহূর্তে তিনি চোখ চেয়ে তার দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, 'এটাই কি সেই প্রেতাত্মা, যাকে তুমি কয়েকদিন ধরে দেখে চলেছ?'

সে ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়ল। উনি ঝোলার ভেতর থেকে একটা ছোট কালচে চকচকে পাথর বার করে আবীরের দুই ভুরুর মাঝখানে ঠেকালেন। আবীরের সারা শরীরে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। দেহে এক অদ্ভুত তরঙ্গ সমস্ত স্নায়ুগুলোকে নাড়িয়ে দিল। মস্তিষ্কের কোষে কোষে এক জ্বলন্ত আগুনের ডেলা ঘুরে বেড়াতে লাগল। মাত্র কুড়ি সেকেন্ড স্থায়ী হল সেই অনুভূতি। পাথরটা সরিয়ে নিলেন উনি। এক নরম স্নিগ্ধ প্রলেপ সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সেই আবেশে তার দু'চোখ জুড়ে ঘুম নামতে শুরু করল।

'এই ঘরে তোমার কাজ শেষ। যাওয়ার আগে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও।' বাধ্য ছেলের মতো ও উঠে দাঁড়াল। নিচে নেমে এসে দেখে চন্দনদার সাথে মা আর বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছে। ওকে ঢুকতে দেখে তাদের মুখে প্রশ্নের চিহ্ন। আবীরের সারা দেহ এখন ঝরঝরে লাগছে। শরীরে নতুন শক্তি। ঘুম ঘুম ভাবটা উধাও। সব থেকে আশ্চর্য লাগছে হাজার চেষ্টা করেও অনিন্দিতার মুখটা ও মনে করতে পারছে না। যাকে একটু আগেও ওপরের ঘরে দেখে এসেছে। কেউ যেন অদৃশ্য শক্তি দিয়ে সযত্নে ঐ দুঃস্বপ্নের সময়গুলো মন ও মাথা থেকে মুছে দিয়েছে।

ওদের উৎকণ্ঠার মুখ দেখে নিজেই বলে, 'রুদ্রমামা কাজ সেরে নিচে আসবেন। আমরা বরং ঐ সময়টুকু গল্প করি।' ওরা বুঝে গেছে আবীর বর্তমানে সুস্থ। পর্ণা দেবী ছেলের মুখে পুরনো জৌলুস দেখতে পাচ্ছেন। মনে মনে সাধক মানুষটার প্রতি বিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। ছেলের মনে যে স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে এতে দুজনেই খুশি। দু'জনে কৃতজ্ঞতা জানালেন চন্দনকে।

আবীর ওদের সাথে বলে উঠল, 'চন্দনদা, ভাগ্যিস তোমার সাথে ব্যাঙ্কে পরিচয় হয়েছিল আর তোমার মুখ থেকে রুদ্রমামার কথা শুনেছিলাম। এ যাত্রায় রক্ষা পেলাম।'

মা-বাবা দুজনে চন্দনকে বললেন, 'ছেলের মুখ থেকে তোমার মেয়ের বিপদের কথা কিছু কিছু শুনেছিলাম।'

এই সময় ওপর থেকে জোরে জোরে মন্ত্রের উচ্চারণ ভেসে এল। তার সাথে কারোর ইনিয়ে-বিনিয়ে করুণ কান্নার শব্দ। তিনজনের মুখ একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

'চিন্তার কোনো কারণ নেই। মামার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। ওঁর যে কি শক্তি তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছি। এমনকি ওঁর গৌহাটির আশ্রমেও আমি গেছি। বিয়ে-থা করেননি। বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। বেশ কয়েক বছর বাদে সন্ধান পাওয়া যায় কামরূপে। ততদিনে মামা সিদ্ধপুরুষ হয়ে গেছেন।'

ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজছে। পর্ণা উঠে দাঁড়ালেন। রান্নাঘরের দিকে এগোলেন। সন্ধ্যে থেকে ওরা এসেছে। তাছাড়া তাদের রাতের রান্নাও হয়নি। পর্ণা দেবী লুচি আর আলুর দম করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

প্রায় এক ঘন্টা বাদে দোতলা থেকে রুদ্রনাথের গুরু গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল। 'তোমরা সবাই একবার ওপরে এসো।' ওরা ভাবল তাহলে কি অতৃপ্ত আত্মার হাত থেকে অবশেষে মুক্তি মিলল? ঘরে ঢুকতে ওরা দেখল আবীরের ছবি আঁকা কাঠের স্ট্যান্ড ভেঙে পড়ে আছে। ঘর্মাক্ত রুদ্রনাথ তার কাজের টুকিটাকি সরঞ্জাম ঝোলার মধ্যে ঢোকাতে ব্যস্ত। খোলা জানলা দিয়ে শীতের ঠান্ডা বাতাস ঘরে ঢুকছে।

ওরা এসে দাঁড়াতে তিনি বললেন, 'হাঁটু গেড়ে বসে পড়ো। শান্তির জল ছিটিয়ে দিচ্ছি।'

একটা বেলপাতা দিয়ে জল ছিটিয়ে দিলেন সবার মাথায়। তারপর বললেন, 'তোমাদের বাড়ি এখন প্রেত মুক্ত। কাল সকালে ঘরটা ভালো করে গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে দেবে। ঘরের কোণে যে ঝুলগুলো রয়েছে ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করে কোনো পুকুরে ফেলে দেবে। আর এই কাঠের স্ট্যান্ডটা বাইরে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেবে।

কেননা এটার ওপর ভর করে মেয়েটার আত্মা অন্ধকার জগতে বিলীন হয়ে গেছে। পারলে এই ঘরে হোম সহকারে সত্যনারায়ণ পুজো করবে।'

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় শ্যামল বাবু বললেন, 'এই ঘর এখন ব্যবহার করা যাবে?'

— 'যে সব উপাচার বললাম তারপরেই ব্যবহার করা যেতে পারে।'

নিচে নেমে এসে সোফায় বসতে বসতে রুদ্রনাথ বললেন, 'ন'টা বাজতে চলল। চলো ভাগ্নে এবার যাওয়া যাক।'

ওরা হাঁ হাঁ করে উঠল, 'দশ মিনিট বসতে হবে।'

পর্ণা দেবী ওদের জন্যে লুচি, বেগুন ভাজা, আলুর দম আর মিষ্টি নিয়ে এলেন।

আবীর বলল, 'কীভাবে ওকে তাড়ালেন একটু বলবেন?'

রুদ্রনাথ লুচি খেতে খেতে বললেন, 'আবার ঐ সব আলোচনা করে তাদের আমন্ত্রণ জানাতে চাও ?'

তিনজনে একসঙ্গে বলে উঠল, 'কখনওই না।'

শ্যামলবাবু ফিসফিস করে চন্দনকে ওঁর দক্ষিণার ব্যাপারটা। জিজ্ঞাসা করতে কথাটা কানে গেল রুদ্রনাথের। তিনি বললেন, 'এটা আমার পেশা নয়। তাছাড়া লুচি-বেগুনভাজা আমার প্রিয়। বরং আর দু'খানা লুচি খেতে পারি।'

পর্ণা দেবী ছুটলেন কিচেনের দিকে মুখে হাসি নিয়ে। যেন কত দিন পরে হালকা মনে হচ্ছে নিজেকে।

ওরা যখন গেট খুলে গাড়ির কাছে গেল তখন ঘড়ির কাঁটা দশের ঘর ছুঁয়েছে। রুদ্রনাথ চাপা গলায় বলল, 'যদি পারো গরম জলে তিনজনেই স্নান করে নিও। আর একটা কথা।' আবীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যে কোনো ভাঙা বা পোড়ো বাড়িতে একা একা ঢুকে পড়তে যেও না। অনেক কষ্টে প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মাকে তোমার কাছ থেকে সরাতে পেরেছি।'

আবীর বলে ওঠে, 'অবশ্যই মনে রাখব। ছোট একটা প্রশ্ন , মেয়েটাকে যারা অত্যাচার করে মারল তাদেরকে ছেড়ে দিল কেন সে?'

— 'ভালো প্রশ্ন। আমরা ক্ষমতাশালী লোকের অন্যায় কেন অনেক সময় সহ্য করি ? প্রতিবাদ করতে কেন পারি না ? ওরাও তাই। নরম দুর্বল চিত্তের মানুষের ওপর তাদের প্রতিহিংসা মেটায়। সময় পেলে গৌহাটি এসো। অনেক রকম আলোচনা হবে।'

গাড়িতে উঠে পড়লেন রুদ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

---

১. 'মুখোশের আড়ালে' গল্পে সে কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে



ও কে?

অফিসের বিশেষ কাজে দিল্লি যেতে হবে, অনেক চেষ্টায় কালকা মেলের একটা টিকিট জোগাড় করা গেল। উপায় নেই, যাওয়ার প্রয়োজনটা খুবই জরুরি। নভেম্বরের গোড়া — যথারীতি কুয়াশার জন্য ট্রেন লেট করা শুরু হল। সন্ধ্যে সাতটা চল্লিশে পৌঁছনোর জায়গায় চার ঘন্টা দেরিতে ওল্ড দিল্লি স্টেশনে ঢুকল। আমাকে থাকার জন্যে পাহাড়গঞ্জের কাছাকাছি হোটেলে থাকতে হবে। এর আগেও যতবার দিল্লি এসেছি নিউ দিল্লি স্টেশনে নেমেছি। কিন্তু এবারে ব্যতিক্রম।

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ স্টেশনের বাইরে বেরোতেই কয়েকজন দালাল এগিয়ে এল। বলে দিলাম পাহাড়গঞ্জে হোটেল বুকিং আছে। আমার লাগেজ বলতে একটা স্কাইব্যাগ। ফেরার টিকিট অবশ্য রাজধানীতে পেয়েছি। দিন দুয়েকের কাজ। পাহাড় গঞ্জের দু'একটা হোটেলে চেনাজানাও আছে। একটা অটোকে বললাম হোটেল ডি হর্সে নিয়ে যেতে। ও ডবল ভাড়া চাইল। জানতাম — রাত বারোটা বাজতে চলেছে। তার ওপর দিল্লি — ধোঁয়া, কুয়াশা আর ঠান্ডায় জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে। জানি দরকষাকষি করে কোনো লাভ হবে না — শুধু সময়ের অপচয়। একেই আঠাশ ঘন্টা ট্রেন জার্নিতে কাহিল অবস্থা। সোয়েটারটা চাপালাম। এই রাতেও গাড়ির সংখ্যা কম নয়। আধ ঘন্টার মধ্যে হোটেলের সামনে পৌছলাম। অটোওয়ালা ভাড়া নিয়েই কেটে পড়ল।

একটা কথা আছে, তুমি যখন ঝামেলায় পড়বে তখন সবদিক দিয়েই পড়বে। হোটেল ডি হর্সে কোনো রুম খালি নেই। চিন্তায় পড়লাম। অনুরোধ করলাম — 'এর আগেও বেশ কয়েকবার আপনাদের হোটেলে উঠেছি। একটু দেখুন। এই রাত্রে কোথায় যাব?'

'বিশওয়াস কিজিয়ে স্যার, নো রুম। কাল এক রুম খালি হোগা...'

আমি অনুনয়ের সুরে বললাম, 'কিছু একটা, এক রাতের জন্য করুন', ম্যানেজার বলল একটু এগিয়ে এই লাইনেই হোটেল চাঁদনী পাবেন। ওখানে পেয়ে যেতে পারেন।

দেখলাম এখানে আর সময় নষ্ট করে লাভ হবে না বরং রাত বাড়বে। ব্যাগ কাঁধে নিয়ে এগোলাম হোটেল চাঁদনীর দিকে। প্রথম দর্শনেই হোটেলটা ভালো লাগল না। একেবারে রদ্দিমার্কা টাইপের। কিন্তু আমাকে এখানেই জায়গা পেতে হবে অন্তত রাতটুকু কাটাবার জন্য। সামনের লোহার জালতি দেওয়া গেট বন্ধ। তিনচার বার ধাক্কাধাক্কি করার পর একজন বেয়ারা গোছের লোক ব্যাজার মুখে খুলল। রিসেপশনটাও তথৈবচ নোংরা ! একজন বসে বসে ঢুলছে। ঘরের কথা বলতেই উত্তর এল, 'কোই রুম খালি নেহি।'

যাহ বাবা...এই হোটেলেও একই অবস্থা! দিল্লিতেই কি সারা দেশের মানুষ এসে গেছে নাকি? ওকে ডি হর্সের কথা বললাম। বিরক্ত মুখে বুকিং খাতাটা খুলে এক পলক দেখেই বলল, 'নেহি... এক ভি খালি নেহি।' আমিও চোখ বুলোচ্ছিলাম। উনিশ নম্বর রুমটার জায়গায় শুধু লাইন টানা। কোনো বোর্ডারের নাম লেখা নেই। আঙ্গুল দেখিয়ে বললাম, 'ভাইসাব, উনিশ তো খালি হ্যায়।'

ম্যানেজার ঘাড় নেড়ে বলল, 'ইয়ে কামরা ব্লকড হ্যায়...'

— 'মতলব?' প্রশ্ন করলাম।

— 'মালিক কা হুকুম, কিসিকো নেহি দেনা।'

এবার আমার অনুরোধের পালা, 'দেখো ভাই বড় বিপদে পড়েছি। একটা রাতের জন্য দাও। কাল সকালেই চলে যাব। তোমার মালিক জানতেও পারবে না।'

একটা পাঁচশো টাকার নোট বার করলাম। ও নোটটা দেখল।

— 'নেহি স্যার, পরে ঝামেলা হলে আমার নোকরি চলা যায়গা।'

— 'আরে আমি রেজিস্টারে সই করব না। নাম লেখার দরকার নেই।'

বেয়ারা আর ম্যানেজারের চোখে চোখে কিছু কথা হল।

বেয়ারা বলল, 'কিছুদিন আগে ঐ ঘরে এক বোর্ডার সুইসাইড করে তারপর থেকে ঐ ঘর বন্ধ।'

শালা! বুঝেছি, আমাকে তাড়াবার বন্দোবস্ত। আরও একটা পাঁচশোর নোট বার করলাম। ওরা একটু চনমনে হয়ে উঠল। ম্যানেজার তবু একটু নারাজ।

আমি বললাম, 'পুলিশ কি ঘর সীল করে দিয়ে গেছে?'

— 'না স্যার, দিন সাতেক আগে এক কাস্টমার ভয় পায় তারপর থেকেই বন্ধ। নাহলে হোটেলের বদনাম হয়ে যাবে।' ঘড়িতে একটা বাজতে বেশি দেরি নেই।

— ' দেখুন ট্রেন জার্নিতে এমনিতেই ক্লান্ত, এখন শুধু একটু ঘুমোতে চাই। ভূত এলেও ঐ কথা বলব। আর কথা নয়, এবার চাবিটা দিন।'

ম্যানেজার দোটানার মধ্যে পড়ল। এদিকে টাকার লোভটাও সামলাতে পারছে না। বেয়ারা মুখ খুলল, 'ও বাবু ভীতু আদমি থা...' ম্যানেজারের কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে বলল, 'আইয়ে, দোতল্লা মে আপকা কামরা।'

ওর সঙ্গে রেলিং ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এলাম। করিডরের দু'পাশে সারি সারি ঘর। কয়েকটা ঘরের দরজার সামনে এখনও রাতের খাবারের এঁটো প্লেট পড়ে আছে। একেবারে কোণের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। যে সুইসাইড করেছিল ঘরটা ভালোই পছন্দ করেছে। ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিল। ডবল বেডরুম, খাটটাও বড়। বেয়ারা জগে খাবার জল ভরে দিয়ে গুড নাইট বলে বিদায় নিল।

দরজা বন্ধ করে চটপট ব্যাগ খুলে রাতের পোশাকটা বার করে নিলাম। ট্রেনে স্নান হয়নি... একটু স্নান করতে হবে। রাত একটা বাজছে। বেয়ারাটা যতক্ষণ ঘরে ছিল একটা জিনিস চোখে পড়েছিল ও বারে বারে ভয় চকিত চোখে বাথরুমের দিকে তাকাচ্ছিল। তবে কি বাথরুমেই আত্মহত্যার ঘটনাটা ঘটেছে? মিনিটের মধ্যে চিন্তাটা সরিয়ে দিলাম।

গাজিয়াবাদ স্টেশন থেকে পুরি-সবজি খেয়ে নিয়েছিলাম। জগ থেকে এক গ্লাস জল খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম। গিজারটা অন করে দিলাম। জল গরম হতে একটু সময় লাগবে। সিগারেট টেনে ধোঁয়ার কুন্ডলী ছাড়লাম। বাড়িতে আগেই জানিয়ে দিয়েছি ট্রেন লেটের কথা। কলটা চালালাম। হাত দিয়ে দেখলাম, কোথায় গরম জল? এ তো কনকনে ঠান্ডা! বেয়ারাটাকে ডাকার কথা মাথায় আসতেই ভাবলাম থাক। একেই ঘর দিয়েছে, ভাববে এই রাতে আবার গরম জলে স্নান করার বায়না! সিগারেটে কয়েকটা টান মেরে ফেলে দিলাম। এই বরফ ঠান্ডা জলে স্নান... অসম্ভব! হাত-মুখ ভাল করে সাবান দিয়ে ধুলাম। হ্যান্ডেলে একটা সাদা তোয়ালে ছিল ওটা নিয়েই ঘেন্না লাগল। লালচে—লালচে ছোপ। সত্যি বলছি তখনও মনে ভয় জিনিসটা টোকা মারেনি। ব্যাগে পাতলা টাওয়েল আছে ওটা আনবার জন্য জল-পায়েই বেরোতে যাব — বিস্ময়ের সাথে দেখলাম ধূমপান করে যেসব ধোঁয়া ছেড়েছিলাম সেগুলো জমাট বেঁধে একটা মানুষের মুখের মতো অবয়ব সৃষ্টি করেছে। বাথরুমের শাওয়ারের ওপর সেটা ভাসছে। ভালোভাবে লক্ষ্য করতে চোখ, কান, নাক সবই বোঝা যাচ্ছে। ভাবলাম চশমা নেই তাই ভুল দেখছি। তাড়াতাড়ি করে চশমাটা পরে বাথরুমের দরজাটার সামনে এলাম।

অবিকল একটা মানুষের মুখমন্ডল। মুন্ডুটা ভাসতে ভাসতে বাথরুমের ছোট্ট জানলাটা দিয়ে বাইরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। প্রথম ভয়ের টোকাটা ধাক্কায় পরিণত হল। কয়েক মিনিটের জন্য বোবা হয়ে গেলাম। তারপরেই মনকে শক্ত করলাম। ওদের বলা আত্মহত্যার ঘটনাটাই আমার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। আর দেরি না করে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে বিছানায় শরীর রাখতেই একরাশ আরাম আর ঘুম আমায় আলিঙ্গন করল। শোবার আগে বাথরুমের দরজাটা লক করে দিলাম। বেশ একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব।

পায়ের নিচ থেকে রোঁয়াওঠা বোঁটকা গন্ধওয়ালা কম্বলটা গায়ে চাপা দিলাম। সারা দুনিয়া কাঁপিয়ে রাজ্যের ঘুম আমার দু'চোখে চলে এল।

বেশ শীত শীত অনুভব হতে ঘুমের ঘোরটা বাধাপ্রাপ্ত হল। হঠাৎ এত ঠান্ডা লাগছে কেন? বাধ্য হয়ে চোখ চাইতেই অবাক হলাম। কম্বলটা আমার গায়ে নেই! কোথায় গেল ওটা? উঠে বসে বড় বড় চোখে দেখি পায়ের কাছে ভাঁজ করা কম্বলটা রয়েছে। যেমনটি শোবার আগে ছিল। তবে কি ঘুমের ঘোরে কম্বল না নিয়েই শুয়ে পড়েছি? সঙ্গে সঙ্গে মস্তিস্ক মনে করিয়ে দিল বোঁটকা গন্ধটার কথা। সত্যি তো, কম্বলটা না নিলে বোঁটকা গন্ধটা পেলাম কী করে?

যতই ঘর পাওয়ার জন্য ম্যানেজারকে সাহসের বড়াই করে আসি না কেন এখন মনে হচ্ছে সাহসে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে!

বুঝতে পারছি না এরপরেও আর কোনো অলৌকিক ঘটনার সম্মুখীন হব কিনা?

যাক, এসব নিয়ে গবেষণা করতে গেলে ঘুমটারই বারোটা বাজবে। তার ওপর কাল সকালেই অফিসের কাজে পার্লামেন্ট স্ট্রিটে ছুটতে হবে। সারাদিনই শোয়া-বসা হবে না। শীতটা ভালোই মালুম হচ্ছে। ঘড়িতে দেড়টা বাজছে। তার মানে দশ মিনিটও ঘুমোইনি। বোঁটকা গন্ধওয়ালা লাল কম্বলটা আবার টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। চোখ বন্ধ করে ভাবলাম, আবার টেনে নেবে না তো? কথাটা মনে আসতেই একটা হালকা শিহরণ শরীরে খেলে গেল। বুঝতে পারছি এই অবাস্তব চিন্তাগুলোই ঘুমটাকে জোর করে তাড়িয়ে দিচ্ছে!

আচ্ছা, ওরা বলল এই ঘরেই সুইসাইড করেছে। আর বেয়ারাটাও যেভাবে বাথরুমের দিকে তাকাচ্ছিল তার মানে ওটাই আত্মহত্যার স্থান! কিন্তু কীভাবে মরল? গলায় দড়ি? অসম্ভব! কেননা টয়লেটের ছাদটা নিচু, তাছাড়া কোনো হুক নেই। তাহলে? মনের মধ্যেই পোস্টমর্টেম শুরু হল আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

এই রকম হয় দেখবেন, যেটা নিয়ে ভাবতে চাইবেন না — আপনার মন সেটা নিয়েই বেশি ভাববে। তাহলে কি আগুনে পুড়ে? কিন্তু কিছুদিন আগেকার ঘটনা — দেওয়ালে পোড়া দাগ থাকত! নতুন রং করলেও বোঝা যেত। আর কী উপায়ে? শুধু প্রশ্নের পর প্রশ্ন— উত্তর কিছু নেই।

ক্রমশ মাথাটার ভেতর তালগোল পাকাতে শুরু করল। এ তো মহা বিপদে পড়া গেল! চোখের ঘুম দূরে সরে যেতে লাগল। মাথাটা এইসব চিন্তায় অস্বাভাবিক গরম হতে শুরু করল। কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। মনে হচ্ছে এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার মস্তিষ্কের কোষে কোষে ঘোরাফেরা করছে!

ধুর ছাই... কী কুক্ষণে এই ঘরটা নিলাম! উঠে একটু ধূমপান করা যাক। পরক্ষণেই ইচ্ছেটাকে দমন করলাম। আবার যদি ধোঁয়ার দেহ তৈরী হয়ে যায়? ধোঁয়ার মুন্ডুটার কথা নতুন করে মনে পড়ে গেল। তবে কি আমি এই মুহূর্তে ভয়ের মধ্যে বাস করছি? কেননা চোখের ভারী পাতা দুটো বন্ধ করতেও পারছি না। চোখ দুটো যেন কিসের আগমনের প্রতীক্ষায় ভীত!

এদিকে সেই রকম ভৌতিক দৃশ্য এখনও পর্যন্ত আমি দেখিনি। তবে কি যে আত্মহত্যা করেছে, তার বিদেহী আত্মা আমার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে? এই কথাটা মাথায় আসতে আমি আরও বেশি করে ভয়ের সমুদ্রে ডুবতে শুরু করলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তীব্র শীতল অনুভূতি শরীরটাকে গ্রাস করল। তার মানে এর আগেও যে বোর্ডার এই ঘরে ছিল সে শুধু শুধু ভয় পায়নি। খুট করে একটা শব্দে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। আধশোয়া অবস্থায় ঘরের চারদিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকালাম। নীলচে আলোতে সারা ঘরটা নীলাভ হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে ঘর জুড়ে সন্ধ্যার আলো আর আমি একা অতন্দ্র প্রহরী!

নজর আটকাল বাথরুমের দরজার ওপর। আধ খোলা হয়ে রয়েছে। হলফ করে বলতে পারি শোবার আগে দরজাটা আমি লক করে দিয়েছিলাম। তাছাড়া লক খোলার শব্দটাও একটু আগে পেয়েছি। এবার আমার মুখে আতঙ্ক দেখা দিল। কেননা চোখের সামনে দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে! উঠে যে জোরালো

আলোটা জ্বালাব সে শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছি। ভেবে পাচ্ছি না... কখন এত ভয় আমার মনে প্রবেশ করল!

এবার কানে এল বাথরুমে কল খোলার আর বালতিতে ছর ছর করে জল পড়ার শব্দ। কে যেন বালতিতে জল ভর্তি করছে!! এই সময় বুদ্ধি একটু জাগ্রত হল। হাত বাড়িয়ে ইন্টারকমের রিসিভারটা তুলে নিয়ে একশ' সাত নম্বরে রিসেপশনে ফোন করলাম। যদি কেউ জেগে থাকে? কাঁপা হাতে শুনতে লাগলাম অপর প্রান্তে রিং হওয়ার শব্দ। বেজেই চলেছে ঘন্টি — হয় ঘুমিয়ে পড়েছে নচেৎ মারা গেছে। রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম। এই অনন্ত নৈশব্দ্যের মধ্যে আমি একা। জল পড়ার শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল। মুখে-চোখে আতঙ্ক নিয়ে বাথরুমের দিকে তাকালাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই আমার সমস্ত স্নায়ু তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল।

বেশ দেখা যাচ্ছে একটা অস্পষ্ট সাদা ধোঁয়ার মতো শরীর বাথরুমে নড়াচড়া করছে। কেননা দরজাটা হাট করে খোলা। একটু বাদেই স্নান করার শব্দ কানে এল। কপালে এই ঠান্ডার মধ্যে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে। প্রেশারটা ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। বুকেও একটা চাপা ব্যথা অনুভব করছি। মন বলছে স্নান শেষ হবার পর ও কি এই ঘরে আসবে? আমি নিশ্চিত সেই বীভৎস দৃশ্য আমার হৃৎপিণ্ড সহ্য করতে পারবে না। সে তার কাজ করা বন্ধ করে দেবে।

স্নান করার আওয়াজ বন্ধ হল। আমি বিছানায় বসে জীবনের অন্তিম সময়ের জন্যে অপেক্ষা করছি।

এরপর কী ঘটবে? আমার মন মস্তিস্ক কে প্রশ্ন করে কোনো উত্তর পেল না। সেই অন্তিম ক্ষণ এল। হালকা ধোঁয়ার শরীরটা বাথরুম থেকে এক পা এগিয়ে ঘরে এল। সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের টেম্পারেচার কয়েক ডিগ্ৰী কমে গেল। চারিদিকে হাড় হিম করা ঠান্ডায় মনে হচ্ছে মর্গের ভেতর বসে আছি!

ছায়ামূর্তিটা বাথরুমের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। এই সময় মাথার ভেতর কে যেন আমাকে অ্যালার্ম দিল! এখনও সময় আছে। পালাও। শরীরটাকে শক্ত করলাম। দরজা খুলে পালাতে হবে। হাত-পা রেডি হয়ে গেল। কিন্তু তখনও আতঙ্কিত হবার আরও কিছু বাকি ছিল। খাট থেকে দাঁড়াবার মুহূর্তে দরজাটা লক্ষ্য করেই ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবার উপক্রম হল। নেই... দরজাটাই ওখানে নেই! এক পলকে চারধারে তাকিয়ে দরজাটা খুঁজে পেলাম না। শুধু দেওয়াল আর দেওয়াল! কপাল থেকে এক ফোঁটা ঘাম হাতে পড়ল — এক কণা বরফের টুকরো যেন! হে ভগবান, গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোচ্ছে না।

ঘাড় ঘুরিয়ে মূর্তিটাকে দেখলাম। ডান হাতের কব্জি থেকে লাল রক্তের ধারা টপ টপ করে মেঝেতে পড়ে আল্পনা আঁকছে। তার মানে ও এইভাবেই আত্মহত্যা করেছে। ঐ অশরীরী এবার টলতে টলতে দু'পা এগিয়ে খাটটার কাছে এল। আমার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনির শব্দ কানে বাজছে। কোথায় পালাব? পালাবার রাস্তা কোথায়? ঐ বীভৎস দৃশ্য এই বয়সে কতক্ষণ সহ্য করতে পারব? হার্টফেল করা কেউ রুখতে পারবে না। ঐ ছায়াশরীর এবার ঘরের পাশে যে চেয়ারটা রাখা আছে সেখানে গিয়ে দু'হাত ঝুলিয়ে মাথা নিচু করে বসল। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ডানহাতের কব্জির একটু ওপরে বাথরুমের রক্তের দাগওয়ালা তোয়ালেটা জড়ানো। সম্মোহিতের মতো ওর ক্রিয়াকলাপ দেখছি। শত চেষ্টাতেও চোখ সরিয়ে নিতে পারছি না।

বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছে। তবে কি আমি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি? বাড়ির কথা মনে পড়ছে। ওরা জানতেও পারবে না কীভাবে আমি মারা গেলাম। ইস... যদি স্টেশনেই রাতটা কাটাতাম! মূর্তিটার মাথাটা ক্রমশ একদিকে হেলে পড়ছে! রক্তের স্রোতও কমে আসছে।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে বালিশের পাশে রাখা মোবাইলটা কুঁই কুঁই করে উঠল। প্রথম অনুভব করলাম কোনো জীবিত মানুষ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে। মাথাটা সক্রিয় হতে শুরু করল। ওর থেকে চোখ না ফিরিয়ে কাঁপা হাতে ফোনটা কানে ঠেকালাম।

স্ত্রীর কণ্ঠ ভেসে এল, 'ভোররাতেই ডিস্টার্ব করছি। সারারাত জেগে তোমার কথাই চিন্তা করছি। অনেকক্ষণ খবর পাইনি তোমার।'

কানে কথাগুলো যেন দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনছে। দেখতে পাচ্ছি সেই ধোঁয়ার ভয়ঙ্কর দেহ ধীরে ধীরে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এ যাত্রা আমি বেঁচে গেলাম।

ভাঙা গলায় বললাম, 'কটা বাজে?'

— 'কেন হঠাৎ এই প্রশ্ন? তোমার গলাটা কীরকম শোনাচ্ছে... এখন ভোর সাড়ে চারটে।'

সামনের চেয়ারটা খালি... শূন্য! অতৃপ্ত আত্মা বিলীন হয়ে গেছে এই ঘরেরই কোনো স্থানে।

'আমি পরে ফোন করব।' বিছানা ছেড়ে মাটিতে পা দিলাম। এখনও পুরোপুরি ভয়টা শরীর থেকে যায়নি। ঐ অবস্থায় জিনিসপত্র ব্যাগে ঢুকিয়ে পোশাক বদলে নিলাম। শুকনো ক্লান্ত মুখে ভোরের আলো ফোটার আগেই চাঁদনী হোটেল ছেড়ে রাস্তায় পা রাখলাম। বাইরে কুয়াশা ঢাকা দিল্লি। আমি চলেছি হোটেল ডি হর্সের দিকে। যেন শ্মশান ফেরত এক যাত্রী।



বৈদ্যুতিক চুল্লি

প্রথম পর্ব

হারু ইলেক্ট্রিকের কাজ করছে প্রায় আট বছর। এখন পুরোপুরি পাকা মিস্ত্রি হয়ে গেছে। ওর অধীনেই এখন তিনটে ছেলে কাজ করে। একটা দোকানও দিয়েছে। দিন রাত একটুও ফুরসৎ নেই।

সেদিন সাত সকালেই মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের ফোন এল, 'হারু, শ্মশান ঘাটের চুল্লিটা বিগড়েছে কাল রাত থেকে। আগেরবার তুই ঠিক করে দিয়েছিলিস। এক্ষুণি একবার গিয়ে দেখ। তাড়াতাড়ি না ঠিক হলে খুব মুশকিল।'

সকাল সকাল হারুর মেজাজটা গেল বিগড়ে। গতবার চুল্লিতে কাজ করার সময়ই কসম খেয়েছিল আর এই আগুন ঘরে ঢুকে সে কোনদিন কাজ করবে না। ওর ছেলেগুলো পর্যন্ত কাজ করতে চায় না। কেমন যেন একটা গা ছমছম করে, যখনই মনে পড়ে যায় প্রতিদিন কত শত মড়া এখানে পোড়ে! কিন্তু চেয়ারম্যানের মুখের ওপর না বলাটাও কঠিন। বাধ্য হল যেতে। আগে গিয়ে দেখতে হবে কোনো শর্ট সার্কিট হয়েছে কি না। যদি বড়সড় কোনো ফল্ট হয়ে থাকে তাহলে জানিয়ে দেবে ইঞ্জিনিয়ার ডেকে সারাতে। তার কম্মো নয়। সাইকেল নিয়ে একাই শ্মশানের দিকে চলল সে। মনে মনে ভাবল তার মানে এখন দাহের কাজ কাঠের চিতায় চলছে।

মিনিট দশেক বাদেই গঙ্গার দিকে রাস্তাটা ধরল। অন্যান্য কাজে ছেলেগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছে। এবার শ্মশানের রাস্তাটা ধরল। একটা বিড়ি ধরাল। শ্মশানের কাছাকাছি আসতেই মাংস পোড়ার গন্ধটা নাকে এসে লাগল। বড় বট গাছটার পাশ দিয়ে শ্মশানের ভেতর ঢুকল। কমিটির ঘরের সামনে এসে সাইকেলে লক করে দিল। ঘরের ভেতর থেকে সৎকার সমিতির ছেলে কমল বেরিয়ে এল, 'এসেছ হারুদা! তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। কাল রাত থেকে চুল্লি অকেজো হয়ে গেছে।'

এক মুখ বিরক্তি নিয়ে সাইকেলের হ্যান্ডেল থেকে যন্ত্রপাতির ব্যাগটা বার করল হারু, 'চুল্লির ঘরের শাটারটা খুলবে চলো।' বলে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগল।

'এক্ষুণি আসছি,' কমল বলল।

একটু ওপরে উঠেই দেওয়াল ঘেরা জায়গাটায় দাঁড়াল ও। এক কোণে এক গাদা শুকনো রজনীগন্ধা পড়ে আছে। একটা বোঁটকা গন্ধ সারা জায়গা জুড়ে ম ম করছে। আধ পোড়া কয়েক গোছা ধূপকাঠি। খালি মধু আর ঘিয়ের শিশি। এসব দেখলেই ওর মনে কীরকম একটা অস্বস্তি জাগে। এরপর আবার আসল ঘরে ঢুকতে হবে। আগের বারে ঢুকে মনে হয়েছিল একটা রাক্ষুসে হিটার ঘরে যেন ঢুকে পড়েছে! সেবার তবু সঙ্গে সহকারী মিহির ছিল। ও দেওয়ালে লাগানো বড় সুইচ বোর্ডটা দেখল। আগে বরং এই মেইন সুইচগুলো চেক করা যাক। এখানে কোনো তারের গন্ডগোল থাকলে ল্যাঠা চুকে যায়।

কিন্তু হারু কল্পনাও করতে পারেনি ইতিমধ্যেই সে বিরাট বিপদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে!

স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে একমনে মেইন সুইচটা খুলছিল। এই সময় কমল পিছনে এসে চাবি হাতে দাঁড়াল। খেয়াল করেনি ও।

'শাটারটা খুলব নাকি?' হঠাৎ গলার স্বরটা শুনে চমকে উঠল হারু। হাত থেকে স্ক্রু ড্রাইভারটা পড়ে গেল। 'একটু সাড়া দিয়ে আসতে পারোনি?' খেঁকিয়ে উঠল হারু।

কমল বুঝল হারুদা ভয় পেয়ে গেছে। চুপ করে রইল। সবে সকাল সাড়ে নটা। চারদিকে রোদ ফটফট করছে! কমলের মত রাতবিরেতে এখানে থাকলে কী করত! মনে মনে ভাবে কমল। ও চাবি দিয়ে মড়া পোড়াবার ঘরের শাটারটা ঘড়ঘড় করে খুলল। হারুর মনে হল ভয়ের দরজাটা কে যেন খুলে দিল!

সেই চামড়া পোড়ার গন্ধটা নাকে ভক করে এসে ধাক্কা মারল।

'আমার হয়েছে যত জ্বালা!' কমল গজগজ করতে থাকে, 'শেষ রাতে মড়াটা এল। ভাগ্যিস আধ পোড়া অবস্থায় চুল্লি খারাপ হয়ে যায়নি! তাহলে আরও কেলেঙ্কারি হত। তবু পুরোটা ছাই হয়নি।'

'তুই থামবি?' হারুর গলা। এইসব কথা বলে আরও ওর মনে ভয় ঢোকাচ্ছে ছেলেটা।

'আমি কিছু জানতে চেয়েছি ?' কমলের এবার রাগ ধরে যায়।

'বেশ, তুমি কাজ করো। আমি নিচে অফিস ঘরে আছি। যদি কেউ আবার মৃতদেহ নিয়ে আসে! অবশ্য অনেকেই এতক্ষণে খবর পেয়ে গেছে। সবাই চারুচন্দ্র ঘাটে চলে যাচ্ছে।' কমল সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। একটা নীরবতা নেমে এল। মাটি থেকে স্ক্রু ড্রাইভারটা নিচু হয়ে কুড়োবার সময় হারুর চোখটা খোলা ইলেকট্রিক চুল্লির ভেতর গিয়ে পড়ল। কিছুটা ছাই পড়ে আছে। বাইরের হাওয়া ঢুকে পড়ার জন্যই বোধহয় ছাইগুলো উড়ছে। চোখটা জোর করে সরিয়ে নিয়ে কাজে মন দিল। কমলকে না চটালেই ভালো ছিল। হারু এমনিতে ভীতু নয়। কিন্তু এইসব জায়গায় এসে পড়লে ও কীরকম ভীতু হয়ে পড়ে! সামনের বড় নিম গাছটার পাতাগুলো বাতাসে শির শির করে কাঁপছে। ঠিক যেন মানুষের মতো ভয় পেয়ে কাঁপছে! ওর মনেও একটা শিরশিরানি ভাব লাগছে।

মেইন সুইচ খুলে দেখল সবই ঠিক আছে। তার মানে এবার ওকে ভেতরে ঢুকতে হবে। তখনই কমলের বলা কথাটা মনে পড়ে গেল। ও বলল মৃতদেহটা পুরো পোড়েনি! তবে কি ছাইয়ের মধ্যে এখনও কিছু অবশিষ্ট পড়ে আছে? কাজ মাথায় উঠল। কমলকে ডেকে আনাই স্থির করল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে দেখল অফিস ঘরে তালা ঝুলছে। এপাশ-ওপাশ তাকিয়েও কমলের দেখা পেল না। সারা শ্মশান এলাকা খাঁ খাঁ করছে। মৃতদেহ না এলে কে-ই বা থাকবে? গঙ্গার ছলাৎ ছলাৎ জলের শব্দ শুধু কানে আসছে। ওকে কিছু না বলে কোথায় গেল? এদিকে ওপরে চুল্লি ঘর খোলা পড়ে আছে! ওখানে একা গিয়ে কাজ করতে হবে ভাবলেই হারুর বুক শুকিয়ে যাচ্ছে! হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল ওর। সাইকেলে চড়ে এখানে আসার সময় একটা মড়া পোড়ানোর গন্ধ পেয়েছিল। কিন্তু এখানে এই মুহূর্তে কোনো মৃতদেহ দাহ হয়নি! তবে? সেই সময় কোনো আত্মা ওর পিছু নেয়নি তো? সে শুনেছে কাছাকাছি কোনো অশুভ আত্মা থাকলে অমন বিটকেল গন্ধ ছাড়ে! সুযোগ পেয়ে এতক্ষণে কাঁধে ভর করেনি তো? কথাগুলো মাথায় আসতেই হাত-পা কেমন অবশ লাগল।

ভয় জিনিসটা একবার মনের মধ্যে ঢুকে পড়লেই বিপদ। মানুষকে একেবারে বশীভূত করে ফেলে। বিচার বুদ্ধি তখন কোনো কাজ করে না। চারিদিকে ভুল দেখতে শুরু করে! যেমন এই মুহূর্তে হারুর অবস্থা। এই সকালবেলাতেও ভয় ওকে পাকে পাকে ক্রমশ জড়িয়ে ধরতে শুরু করল। মনেও পড়ল না পকেটে মোবাইলটা রয়েছে। ইচ্ছে করলেই সবাইয়ের সাথে এক্ষুণি যোগাযোগ করতে পারে।

আচমকা ওর কানে ঘড়ঘড় করে শাটার টানার শব্দটা এসে ঢুকল। ওর মুখের সমস্ত রক্ত কে যেন এক নিমেষে ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিল। ওখানে তো কেউ নেই! নিজে থেকে শাটারটা বন্ধ হল কী করে? বুকটা ধড়ফড় করছে। যন্ত্রপাতির ব্যাগটা ফেলে রেখেই পালাবে? কিন্তু কয়েকটা দামি যন্ত্র আছে। বড় একটা ঢোঁক গিলল ও। সিঁড়িটার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল। আচ্ছা এমন তো হতে পারে, কমল ওর চোখকে ফাঁকি দিয়েই ওপরে গেছে! অন্যমনস্কতার জন্যে দেখতে পায়নি।

এবার মনে একটু সাহস এল। ভাবনার ভূত মাথা থেকে নামতে শুরু করল। দেশলাই জ্বালিয়ে আবার একটা বিড়ি ধরাল। কিন্তু ওর মস্তিষ্কে অশুভ একটা সংকেত কেউ দিয়ে চলেছে। শ্মশানের গাছগুলোর ওপর দিয়ে একটা সকরুণ হাওয়া বয়ে চলেছে। বাতাসের কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে শুধুমাত্র

একটা আতঙ্কময় করুণ বিলাপধ্বনি। মনে হয় যেন কোনো হতভাগ্যের শেষকৃত্যের জন্য কোনো অশরীরীর আর্তনাদ! বাতাসের জলীয় কণাগুলো বয়ে আনছে সেই বিষাদময় ঐ ধ্বনির সকরুণ ব্যঞ্জনা!

বিড়িটা ফেলে দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করল মনকে শক্ত করতে। ব্যাগটা নামিয়ে এনে কেটে পড়তে হবে। হারু চুল্লি ঘরে যাবার জন্য সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়েই চরম ভুলটা করে ফেলল। কমলের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানে শুনেও ভয়টা কমতে লাগল। কিন্তু যার নাম ধরে ডাকা তার কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

চুল্লির সামনে এসে ও অবাক হয়ে গেল। শাটারটা পুরো খোলা! ও নিজের কানে শুনেছে বন্ধ হবার ঘড়ঘড় শব্দ। তাহলে আবার কখন খুলল? তাও নিঃশব্দে? এ যেন ভেলকিবাজি!

ওকে এবার ঐ দু'ধারে তারের বড় বোর্ডগুলোর কভারটা খুলতে হবে। এই সময় চোখে পড়ল ছাইগুলোর ভেতর হাঁটু মুড়ে বসে পিছন ঘুরে কে যেন কিছু খুঁজছে! ভয়ের জায়গায় এবার রাগটা ফিরে এল। ব্যাটা কমল এখানে বসে মড়ার ছাই ঘাঁটছে? আর সে যে গলা ফাটিয়ে ডাকছে তার কোনো সাড়া দিচ্ছে না!

হারু বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, 'কী রে কালা! আমার ডাক কানে যাচ্ছে না? এই ছাইয়ের ভেতর কী খুঁজছিস? কী কী অংশ পোড়েনি তাই দেখছিস?' কমল হাঁটু গেড়ে বসেই জবাব দিল, 'কাল রাতে নাভিটা গঙ্গার জলে দেওয়া হয়নি! ওটা জলে না দিলে আত্মার সদগতি হয় না।'

কমলের গলার আওয়াজটা কেমন যেন অচেনা ঠেকল হারুর কানে। ঐ ছোট্ট বদ্ধ ঘরে ওরা শুধু দু'জন। মনে একটা সন্দেহ দেখা দিল। এই কাজ তো কমল করে না! আর ও নিঃসন্দেহ যে এটা কমলের গলার স্বর নয়। কেমন যেন ফ্যাঁসফেঁসে, ভেজা ভেজা কণ্ঠ!

ইতিমধ্যে লোকটা ডান হাতে একটা মাংসের ডেলা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সরু পোড়া হাতটা হারুর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'এতক্ষণে শান্তি পেলাম। নিজের নাভিটা নিজের হাতেই গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিই গে যাই।'

হারু লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে একেবারে চমকে উঠল। এটা কে? মুখের জায়গায় শুধু পোড়া একটা মুন্ডু! কী বীভৎস লাগছে! মনে হচ্ছে এখনই ওর গলা টিপবে। ওর হাতের তালুতে রয়েছে একটা ছাই মাখানো মাংসের টুকরো। ওর কথায় নাভি! একেই কাল রাতে শেষ পোড়ানো হয়েছিল? ঐ ভয়ঙ্কর দৃশ্য আর কথাগুলো ওর মনে ঢুকে পড়তেই আতঙ্কের শীতল নাগপাশ তার হৃৎপিণ্ডকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। দু' চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। এরপরেই ওর গলা চিরে একটা বিকট ভয়ার্ত আর্তনাদ বেরিয়ে এল। ওর স্নায়ুগুলো ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে যেতেই পা ভেঙে মাটিতে দেহটা আছড়ে পড়ল।

সেই সময় চা খেয়ে আর একটা গ্লাসে করে হারুর জন্যে নিয়ে আসছিল কমল। ঐ ভয়ঙ্কর চিৎকার আর পড়ে যাওয়ার শব্দ কানে আসতেই কমল ছুটে ওপরে চলল। নির্ঘাৎ কারেন্ট খেয়েছে হারুদা!

কমল ওখান থেকেই কাউন্সিলার আর সেক্রেটারিকে ফোন করল। কেননা অজ্ঞান অবস্থায় হারুকে দেখে কমলের অভিজ্ঞ চোখ বুঝে গেছে রীতিমতো ভয়ে ও অজ্ঞান হয়ে গেছে। তার কারণ হারুর মুখ জানান দিচ্ছে সে কথা। পুরো মুখটাই ভয়ের মুখোশ হয়ে গেছে।

দিন পনেরো লেগেছিল ওর স্বাভাবিক হতে। কেননা চোখ বন্ধ করলেই সেই পোড়া চ্যালাকাঠের মতো হাড়ের নড়বড়ে কাঠামোটা সামনে ভেসে উঠত।

হারুর মা ছেলের মুখে শুনে ঠাকুরবাড়ি গেল। প্রসাদী ফুল নিয়ে এসে মাথায় দিল। ধীরে ধীরে হারুর মন থেকে সেই ভয়ঙ্কর দিনটা অস্পষ্ট হতে শুরু করল।

তারপর সে আবার কাজে লেগে পড়ল। এই কয়েক দিনে কাজের বেশ ক্ষতি হয়ে গেছে। এদিকে সামনেই বিশ্বকর্মা পুজো আসছে। বেশ কয়েকটা বারোয়ারিতে আলো-মাইক লাগানোর কাজ পেয়েছে। সারাদিন রাত ব্যস্ত। ওর মা ওকে বলে দিয়েছে একা কোথাও যাবি না। সঙ্গে তোর সহকারী মিহিরকে অন্তত রাখবি।

মায়ের এই কথাটা শুনে ওর মনে একটা খটকা লাগে। কারণটা কী? কী জন্য এই সাবধানবাণী? তবে কি এখনও কোনো ভয়ের সম্ভাবনা আছে? এইসময় পুরনো কথাটা ওর মনে পড়ে যায়। কোনো আত্মা এখনও ওর ওপর ভর করে নেই তো? সেই বট গাছের তলা দিয়ে শ্মশানে ঢোকার সময় পচা চামড়া পোড়ার গন্ধ...

ওর ধারণা কিছুদিনের মধ্যেই সত্যিতে পরিণত হয়েছিল। সেইদিন থেকেই ওকে ভূতে পেয়েছিল। কেউ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। এমনকি নিজেও নয়। যদি কখনও সুযোগ বা সময় পাই আপনাকে সেই ঘটনাটাও জানাব।

দ্বিতীয় পর্ব

হারুর কয়েক দিন ধরেই খিদে-তেষ্টাটা একটু বেশিই বেড়ে গেছে। হয়ত বিশ্বকর্মা পুজোর কাজের দৌড়ঝাঁপের জন্য। কয়েকটা বারোয়ারী আলোর অর্ডার পেয়েছে। হারুর মা বর্ণালী কয়েকদিন ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। যে ছেলে খেতে বসে ভাতের থালা নিয়ে শুধু নাড়াচাড়া করে। এখন ঠিক তার উল্টো। দু'জন মানুষের খাবার ও একাই খাচ্ছে। বর্ণালী নিজের মনকে বোঝায় — ইয়ং ছেলে, তার ওপর এত খাটাখাটুনি। কিন্তু ছেলের স্বাস্থ্য দিনকে দিন এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন? চোয়াল দুটো চামড়া ঠেলে বেরিয়ে আসছে! হাত-পাগুলো দড়ি পাকানো। হনু উঁচু! বর্ণালীর মনে কিছুদিন আগে শ্মশানে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা পুনরায় জেগে ওঠে। শ্মশান থেকে নিজের অজান্তে হারু কাউকে বয়ে আনেনি তো? কথাটা মনে হতেই বুকটা শিউরে ওঠে। পুজোর আশীর্বাদি ফুল নেবার সময়ই ঠাকুর মশাই বলেছিলেন ছেলেকে কিছু দিন চোখে চোখে রাখতে। কেননা কোনো খারাপ হাওয়াও লেগে থাকতে পারে। অত সামনাসামনি কোনো মৃত মানুষকে দেখা মোটেই মঙ্গলকর নয়। আর কয়েকদিন দেখা যাক তারপর না হয় বর্ণালী একবার ফকিরবাবার শরণাপন্ন হবে। উনি কামরূপ থেকে তন্ত্রমন্ত্র অনেক কিছু শিখে এসেছেন। এলাকার মানুষ খুব ভিড় করে ওঁর কাছে।

হারুর মনেও এই কথাটা কয়েকদিন ধরে ঘুরছে। এখন যেন সারাক্ষণই একটা খিদে খিদে ভাব লেগে থাকে। এদিকে এত খাচ্ছে তবুও চেহারাটা কেমন প্যাঁকাটির মতো হয়ে যাচ্ছে। আগে সাইকেলে চেপে কাজে গেলে পাড়ার মেয়ে রুমি তাকিয়ে দেখত। এখন চোখ ঘুরিয়ে নেয়। ওর মনেও পুরোনো কথাটা খেলা করতে লাগল। ঐ শ্মশান থেকেই আজ পর্যন্ত তার শরীরের ভেতর কেউ ঢুকে বসে নেই তো? মনের জোরটা কেমন কম কম লাগল। ওর শরীরের মাঝে যে ঢুকেছে সে এই এত খাবার খেয়ে নিচ্ছে না তো?

রাত্রে শুতে যাওয়ার সময় বিড়ি মুখে হারু আবোল-তাবোল ভেবে চলেছে। এই সময় মনে এল একটা ছোট পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে তার ধারণা সঠিক কিনা। ছোটবেলা থেকেই জানত আয়নার সামনে দাঁড়ালেই পরিষ্কার হয়ে যাবে মনের সন্দেহ। কেননা ভূতের ছায়া আয়নায় প্রতিফলিত হয় না। বিড়িটা ফেলে আয়নার দিকে এগোল। রাত্রি বেশ ঘন হয়েছে। ওর মা অনেকক্ষণ হল শুয়ে পড়েছে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। বাগান থেকে শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। আয়নাতে মুখ দেখার আগে মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো একটা কথা খেলে গেল। যার ফলে ও দাঁড়িয়ে গেল। যদি আয়নায় নিজেকে দেখতে না পায়? সেই অবস্থা ওর হৃদয় সহ্য করতে পারবে? দোটানায় পড়ে গেল। আর এক পা এগোলেই আয়নাটা। ভাদ্র মাসে একেই গুমোট। তার ওপর এই পরিস্থিতিতে ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল। মেরুদন্ড বেয়ে হিমশীতল স্রোত নিচের দিকে নেমে চলল। বুকের মধ্যে সবটুকু সাহস কর্পূরের মতো উবে গেল। সম্মোহিতের মতো চুপ করে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। দেওয়ালে ঝোলানো আয়নাটা যেন ওকে হাতের ইশারায় ডাকছে — আয় আয়, একবার দেখ তোর মুখখানা। খানিক বাদে ও বাস্তবে ফিরল। কোনোরকমে ভারী পা দুটো টেনে চৌকির কাছে গেল। আয়নার দিকে না তাকিয়ে নিজের অবসন্ন দেহটাকে বিছানায় এলিয়ে দিল। যা করবার কাল সকালেই করা যাবে। রাত্রিতে ওদের শক্তি সব থেকে বেশি থাকে। এখন কিছু করতে যাওয়া মানে যেচে বিপদ ডেকে আনা।

তার মানে ওর অবচেতন মন মেনেই নিচ্ছে কোনো অশুভ আত্মার উপস্থিতি। সারারাত এপাশ ওপাশ করে কাটাল হারু। ছোটখাটো শব্দেও চমকে চমকে উঠছে। অবশেষে ভোরের আলো দেখা দিল। ও বুঝতে পারছে এইভাবে যদি তার বিনিদ্র রাত কাটে ও অচিরেই অসুস্থ হয়ে পড়বে। এদিকে সকাল থেকেই শুরু হয়ে যাবে কাজের মেলা।

ওর মা সকালেই ছেলের দিকে তাকিয়ে বুঝল রাত্রে ছেলের ঘুম হয় নি। তাই বলে ওঠে, 'সাতসকালে উঠলি কেন? আজ বাজারে যেতে হবে না।' হারু কথা না বাড়িয়ে মুখ ধুতে গেল। চোখ চেয়ে শুয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। মাথার মধ্যে এই চিন্তার পাহাড় যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে তার নিস্তার নেই। কিন্তু সমাধানের পথ ও জানে না।

মুখ ধুয়ে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নিজের পরিষ্কার মুখটা দেখতে পেল। একটা শান্তির প্রলেপ মনটাতে পড়ল। ইস, রাত্রে সাহস করে দেখলে ঘুমটা মাটি হত না। মনটা অল্প খুশি হল। বর্ণালী চা আর দুটো বিস্কুট আনল। ওটা দেখে হারুর খিদেটা চাগাড় দিয়ে উঠল। মাত্র দুটো বিস্কুট! ও উঠে গিয়ে বিস্কুটের কৌটোটা নিয়ে এল। তারপর মনের আনন্দে বিস্কুট খেয়ে চলল। বর্ণালীর মনে হল এ তার ছেলে হতেই পারে না। কিছুদিন আগেও আধখানা বিস্কুট মুখে ফেলে যে চা খেত তার এত অস্বাভাবিক পরিবর্তন কী করে সম্ভব? তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বর্ণালী বেরিয়ে গেল। কীরকম একটা চাপা ভয় ওর শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বাইরে থেকেও বিস্কুট খাবার কড়মড় শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে। যেন একটা ছোট রাক্ষস বসে বসে মানুষের হাড় চিবোচ্ছে। প্রায় গোটা বারো বিস্কুট খেয়ে গরম চা এক চুমুকে শেষ করে উঠে দাঁড়াল হারু, 'মা, বাজারের থলি দাও। একটু মাংস নিয়ে আসি।' ছেলের কথা শুনে মায়ের মুখটা শুকনো হয়ে যায়। এমনিতে কথাটা কিছুই নয়। কিন্তু এখন যেন কেমন শুনতে লাগে বর্ণালীর। শ্মশানের ঘটনাটা ঘটার আগে বরং হারু বিধবা মায়ের মুখ চেয়ে বলত আমার জন্যও নিরামিষ রেঁধো। মাছ-মাংসের ঝামেলা করার দরকার নেই। আর এখন? প্রতিদিনই মাছ-মাংসের ভোজ। বর্ণালী মনে মনে ঠিক করে হারু কাজে বেরিয়ে গেলে সে ঐ তান্ত্রিকের বাড়ি আজ যাবে।

এদিকে বাজারের পথে যেতে যেতে হারু মনস্থির করে নেয়। যাই ঘটুক আজ রাত্রেই ও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনের ভুলটা সংশোধন করে নেবে। সেই মুহূর্তে ও ভাবতে পারেনি রাত্রি আসার আগেই পরীক্ষার ফল ওর সামনে এসে যাবে!

বেলায় জলখাবার সেরে সাইকেল নিয়ে বেরোল হারু। এখন সে যাবে তেঁতুলতলা ক্লাবে। কালকে বিশ্বকর্মা পুজোর প্যান্ডেল বাঁধা হয়ে গেছে। এখন চলছে লাইট লাগানোর কাজ। মিহির আগেই পৌঁছে গেছে। বর্ণালী জানে সেই দুপুরে ফিরবে ছেলে ভাত খেতে। কোনরকমে রান্না সেরে বাড়িতে চাবি দিয়ে ও চলল ফকির বাবার ডেরায়। ওখানে ভিড় একটু পাতলা হলে হারুর ব্যাপারটা বলল।

সব শুনে কপালে লাল তিলক কাটা বাবা বলল, 'দেখো মা, আজ থেকে তিনদিন রাত্রে ছেলেকে ভালভাবে নজর রাখতে হবে। ও কী করে সারারাত সেটা জেনে আমাকে বলবে। তারপর আমি আমার কাজ আরম্ভ করব।' বর্ণালীর মুখটা শুকিয়ে গেল।

— 'বাবা, তার আগে কিছু করা যায় না?' ওর গলায় আকুতি।

— 'আগে আমাকে জানতে হবে সত্যি কোনো অপদেবতা ওর ঘাড়ে চেপে আছে কিনা? তবে তুমি খুব সাবধানে আড়ি পাতবে। ছেলে যেন বুঝতে না পারে। তাহলে হিতে বিপরীত হতে পারে।'

বড় বড় চোখে কথাগুলো বলল ফকির বাবা। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে চলল বর্ণালী। মাথার মধ্যে চিন্তার ভার। কয়েক বছর আগেই স্বামীকে হারিয়েছে। এখন হারুই সব আশা ভরসার স্থল। ঠাকুরকে ডাকতে থাকে। রক্ষা করো আমার ছেলেকে।

দুপুরবেলা হারু বাড়ি এসেই বলল, 'জলদি ভাত বাড়ো। আমি এক মিনিটে স্নান সেরে আসছি।' যেন দু'দিন অনাহারে আছে ছেলে। বর্ণালীর মনে ক্রমশ দূরাগত এক ভয়ের ছায়া জমাট বাঁধছে। ভাত আর পুরো

মাংসের বাটিটা এনে ছেলের সামনে রাখল। সবিস্ময়ে দেখল, হারু মাথাটা পর্যন্ত ভালো করে মোছেনি। টপ টপ করে জল গড়াচ্ছে।

আর চুপ করে থাকতে না পেরে বর্ণালি বলল, 'তুই মাথাটা পর্যন্ত ভালো করে মুছিসনি। এত খাবার তাড়া! পেটে কি রাক্ষস ঢুকেছে নাকি?'

হারু কোনো কথা না বলে একবার শুধু মায়ের মুখের দিকে তাকাল। সেই চাউনি দেখে বর্ণালীর সারা শরীর অবশ হয়ে গেল। এ কার চাউনি? দুটো চোখ দিয়ে যেন তাকে ভস্ম করে দেবে। দুটো চোখে যেন রাজ্যের কুটিলতা আর হিংস্রতা আশ্রয় নিয়েছে। এই দৃষ্টির সামনে কোনো সুস্থ মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

বর্ণালী কোনরকমে উচ্চারণ করল, 'তুই খা, আমি স্নান করে আসছি।' যেন পালিয়ে বাঁচল। বাথরুমে ঢুকে ভয়ে কাঁপতে লাগল। একটু আগে দেখা ঐ ভয়ঙ্কর চোখ দুটোকে ভুলতে পারছে না। এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে ও বলতে পারে ওটা তার ছেলের চোখ নয়। ওর ভেতর লুকিয়ে থাকা কোনো শয়তানের চোখ!

হারু খেয়েদেয়ে কাজে বেরিয়ে গেল। ও পৌঁছলে তবে মিহির খেতে যাবে। তেতুঁলতলার মাঠটা ধরল। কাল বিশ্বকর্মা পুজো বলে আকাশে বেশ ঘুড়ি উড়ছে। বছর পাঁচেক আগেও ওর ঘুড়ি ওড়াবার নেশা ছিল। বারোয়ারীতে এসে মিহিরকে ছুটি দিল। নিজে মইয়ের ওপর উঠে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কাল বেলার মধ্যেই কাজটা কমপ্লিট করতে হবে।

বিকেলের মধ্যেই খিদে পেয়ে গেল হারুর। নিজের মনেই অবাক হল। ঘন্টা তিনেক কাটেনি পেট ভরে খেয়ে এসেছে! পুরনো চিন্তা আবার কুরে কুরে খেতে শুরু করল। তবে কি পুনরায় ঐ আত্মা তার শরীরে ফিরে এসেছে? আজ রাত্রেই এর ফয়সালা করতে হবে। যা থাকে কপালে।

বিকেল পাঁচটার সময় আর স্থির থাকতে পারল না খিদের চোটে। রীতিমতো গা গুলোচ্ছে। মিহিরকে বলল, 'তুই বাকি আটটা টিউবলাইট ফিট করে বাড়ি যাবি। বাকিটুকু কাজ কাল সকালে হবে। আমি বাড়ি যাচ্ছি। খিদের চোটে নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাবার জোগাড়।' সাইকেল নিয়ে বাড়ির দিকে চলল ও। মিহির অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে তার মালিকের দিকে।

সূর্য পশ্চিম দিকে হেলছে। আকাশে ঘুড়ির মেলা। তেতুঁলতলা মাঠের কাছে এসে হারু দেখে অধীরদার ছোট ছেলে বাবলু বড় উঁচু তেঁতুল গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। ও সাইকেল থামিয়ে দেখল উঁচু সরু ডালটাতে একটা বড় লাল ঘুড়ি কেটে এসে আটকে আছে। এই গাছের নামেই মাঠের নাম। গাছটা খুব অদ্ভুত গড়নের। মাটি থেকে গাছের মোটা কান্ডটা সোজা খানিকটা আকাশের দিকে উঠে গেছে। তারপর থেকে ডালপালা শুরু। সেই জন্যে কেউই গাছটাতে উঠতে পারে না। সে নিজেও ছোট বেলায় ঘুড়ির জন্য বাবলুর মত গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকত। যদি হাওয়ায় পড়ে যায় ঘুড়িটা! বাবলুর করুণ মুখটা দেখে ওর এই মুহূর্তে বেশ কষ্ট লাগল। একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি? জানে অসম্ভব, তবু!

বাবলু বলল, 'হারু কাকা, দাও না আমায় ঘুড়িটা পেড়ে। কালকে ওড়াব। মাত্র দুটো ঘুড়ি বাবা কিনে দেছে।'

হারু সাইকেলটা স্ট্যান্ড দিয়ে বলল, 'তুই জানিস বাবলু, এই গাছে ওঠা খুব কষ্টসাধ্য। তবু আমি চেষ্টা করছি।'

হারু চটিটা খুলে গাছের মোটা গুঁড়িটার কাছে এল। হাত দুটো দিয়ে আঁকড়ে ধরে ওপরে ওঠার জন্যে চাড় দিল।

আশ্চর্য কান্ড! ও অতি অনায়াসেই হাত-পায়ের সাহায্যে গাছের উঁচুতে উঠতে লাগল। নিচ থেকে এগারো বছরের বাবলুর চোখে দৃশ্যটা কীরকম অদ্ভুত লাগল! মনে হচ্ছে একটা বিশাল গিরগিটি সরসর করে গাছের ওপরে উঠছে। ঐ বাচ্চাটা এই রকম ভাবে কোনো মানুষকে গাছে চড়তে দেখেনি। গাছের ওপর যেসব পাখিগুলো ছিল তারাও ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আকাশের দিকে উড়ে গেল। পাঁচ মিনিটেই হারু ঘুড়ির

কাছাকাছি পৌঁছে গেল। ও তাকিয়ে দেখল লাল ঘুড়িটা একটা সরু ডালে আটকে আছে। ঐ ডাল ওর শরীরের ভার নিতে পারবে না। হাত বাড়ালেও নাগাল পাবে না! ইস, এত কষ্ট বৃথা যাবে! শেষ চেষ্টা করার জন্য হাতটা বাড়াল। হাতটা কয়েক ফুট লম্বা হয়ে ঘুড়িটা ধরে ফেলল।

হারু নিচ থেকে বাবলুর ভয়ার্ত আর্তনাদ শুনতে পেল, 'ভূত! ভূত! বাঁচাও! বাঁচাও!' ভয়ে নীল হয়ে গিয়ে বাবলু প্রাণপনে বাড়ির দিকে দৌড়োল। গাছের ওপর বসে পড়ন্ত বিকেলে হারুর আসল সত্যিটা অনুভূত হল। এই অসম্ভব কাজটা ওর দ্বারা হল কী করে? একটা নিদারুণ আতঙ্ক ওকে জড়িয়ে ধরল। গাছের অত উঁচু থেকে এখন নামবে কি করে বুঝতে পারছে না। সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। কোনরকমে হাত পা ছেঁচড়ে যখন মাটিতে নামল তখন হামাগুড়ি দিয়ে সন্ধ্যের অন্ধকার সারা মাঠটাকে ঘিরছে। এরপর সাইকেল চড়ে অবসন্ন শরীরটাকে নিয়ে বাড়ির দিকে চলল।

রাত্রের পরীক্ষার আর কোনো প্রয়োজন নেই তার কাছে। বর্তমান পরিস্থিতি ভালোভাবে তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে কোনো অশরীরি শক্তি তার ওপর ভর করেছে। এবং সে এও বুঝতে পেরেছে সেই অশুভ শক্তি পুরোটা তাকে এখনও গ্রাস করতে পারেনি। যদি করত তাহলে এই চিন্তাগুলো তার মনে আসত না।

এর থেকে মুক্তির উপায় কী? কে আলোর পথ দেখাবে তাকে? বাড়িতে এসে ঢুকল সে। বর্ণালী দেখল ছেলের হাতে-পায়ে রক্ত।

'কী করে হল?' বর্ণালীর গলায় উৎকণ্ঠা।

— 'সাইকেল থেকে পড়ে গেছি। ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই।'

মাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল হারু। বিশ্রী গরম পড়েছে। হারুর খিদেটা আবার চাগাড় দিতে শুরু করল।

'স্নান করে আসছি। তুমি দুটো রুটি আর তরকারি দাও। খিদে পেয়ে গেছে।' বলে ও বাথরুমে ঢুকল। লাইটের আলোতে দেখল হাত দুটো বেশি ছড়েছে। এখনও রক্ত বেরোচ্ছে। ঐ তাজা লাল রক্ত খাওয়ার হঠাৎ ইচ্ছে জাগল। প্রাণপণ শক্তিতে ইচ্ছেটাকে দমন করল ও। তাড়াতাড়ি বাথরুম ছেড়ে বেরিয়ে এল। মন বলছে একা থাকলে ও বেশিক্ষণ ইচ্ছেটাকে আটকাতে পারবে না।

বর্ণালী ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছে হারুর মনে বিরাট এক দ্বন্দ্ব চলছে। কপালের ওপর চিন্তার অজস্র রেখা ! ছেলের ঐ অবস্থা দেখে কোনো মা স্থির থাকতে পারে?

'হারু, তুই আমার কাছে কিছু লুকোস না। তোর মনে কিছু চলছে।' মায়ের গলায় আবেগের ছোঁয়া স্পষ্ট।

রুটি খেতে খেতে ও বলল, 'কী আবার হবে আমার? তুমি ভুল করছ।'

তখনই যদি হারু মাকে সব খুলে বলত তাহলে হয়ত ভালোই হত। রাত্রের ঐ হাড় হিম করা ঘটনাটা ঘটত না।

অন্তিম পর্ব

রাত তখন বারোটা। বর্ণালী চুপিসাড়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে হারুর ঘরের খোলা জানালাটার কাছে এল। ভাদ্র মাসের পচা গরমের জন্য হারু মশারিটাও খাটায়নি। ঘরের রাত-আলোটা জ্বেলে পাখা চালিয়ে ঘুমোচ্ছে।

একটু দাঁড়াবার পরেই বর্ণালী লক্ষ্য করল ছেলে ঘুমের মধ্যেই উশখুশ করতে শুরু করল। যেন চাপা স্বরে কারুর সঙ্গে কথা বলছে! কান খাড়া করেও কিছু বুঝতে পারল না পাখাটার আওয়াজের জন্য। ঘুমের ঘোরেই হারু একবার চৌকির ওপর উঠে বসল। বর্ণালী সাবধান হল। তাকে দেখে না ফেলে! ফকিরবাবা বলে দিয়েছিল। নজর রাখবে এমনভাবে যেন দেখতে না পায়! হারু বিছানায় বসে বিস্ফারিত চোখে বন্ধ দরজাটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। যেন কারোর আসার প্রতীক্ষা করছে। বর্ণালীর ঐ দৃশ্য দেখে মুখটা চকখড়ির মতো সাদা আকার ধারণ করল। এবার ও দেখতে পেল একটা কালো ছায়ার মত শরীর দরজার দিক থেকে এগিয়ে এসে ছেলের গায়ে লেপটে গেল। অমনি হারুর দেহটা অসম্ভব রকম ভাবে কেঁপে উঠল।

বর্ণালীর বুঝতে বাকি রইল না ছেলের ভেতর কোনো ভৌতিক আত্মা প্রবেশ করল। ওর বুকের ভেতর হৃৎপিন্ডটা ভয়ে লাফাতে লাগল।

বর্ণালীর মস্তিষ্ক ওকে জানিয়ে দিল আর এক মুহূর্ত এখানে থাকলে ঐ অশরীরীর চোখে ও ধরা পড়ে যাবে। ও দ্রুত পায়ে ঘরে ফিরে এল। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খেল। যদি কেউ জানতে পারে তার পাশেই থাকা প্রিয়জনকে কোনো আত্মা ভর করে আছে যত বড় সাহসীই হোক, সে ভির্মি খাবে। বর্ণালী ভেবে পাচ্ছে না সারা রাত একা একা সে কাটাবে কী করে? এরপর কী ঘটবে তাও সে জানে না! মনে মনে ঠিক করে নেয় কাল সকালেই ফকিরবাবার কাছে যাবে। আর দেরি করলে তার একমাত্র ছেলেকে বাঁচাতে পারবে না।

ও ঘরে এখন কী হচ্ছে? সেটা জানার আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। কেননা বেচারা ছেলেটা একা ঐ ঘরে পড়ে আছে ঐ অন্ধকারের আত্মাটার সাথে। কি করবে সে? সিদ্ধান্ত নিতে বেশ কিছু সময় কেটে গেল। অবশেষে যাওয়াই স্থির করল। যা থাকে কপালে — মা হয়ে নিজের সন্তানকে বাঁচাতে তার নিজের যে কোনো ক্ষতি হয় হোক।

যখন ও ঘরে যাওয়ার জন্য বর্ণালী পা বাড়াল তখন ঘড়িতে সময় রাত দেড়টা। অতি সন্তর্পণে জানালা দিয়ে উঁকি মারল। ঘরের ভেতর দৃশ্যটা দেখে বর্ণালীর হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাবার উপক্রম হল! দেখে চৌকির ওপর ছেলে বসে ছড়ে যাওয়া ডান হাতটাকে বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়ে খোঁচাচ্ছে। যেই রক্তের ধারা বেরিয়ে আসছে, মুখে করে চুষছে! ঐ বীভৎস দৃশ্য দেখে বর্ণালীর মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট চিৎকার বেরিয়ে এল। ঐ আওয়াজ শুনে সঙ্গে সঙ্গে হারু জানলার দিকে তাকাল। আধো অন্ধকারে বর্ণালী দেখল হারুর জায়গায় একটা বুড়োটে মতো লোক বসে আছে। নীলচে আলোয় বীভৎস মুখটাতে কোনো প্রাণের স্পন্দন নেই!

বর্ণালীর শরীরের সমস্ত স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে আসছে। চোখে কালো অন্ধকার ঘনাচ্ছে। বুড়োটা একদৃষ্টে বর্ণালীর গলায় ঝোলানো নারায়ণ ঠাকুরের লকেটটা দেখছে। দু'মিনিট বাদেই একটা কালো ছায়া হারুর দেহ থেকে বেরিয়ে এসে দরজার দিকে গেল। হারুও নেতিয়ে পড়ল বিছানায়। বর্ণালী আবছা অন্ধকারে দেখল কালো পিচের মতো এক দলা অন্ধকার দরজার ভেতর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এল। তারপর হাওয়ায় ভেসে সামনের কাঁঠাল গাছটার কাছে গিয়ে মিলিয়ে গেল। পরক্ষণেই ঐ গুমোট গরমেও কাঁঠাল গাছের ডাল সমেত পাতাগুলো কেঁপে উঠল। মনে হল কয়েকটা হনুমান গাছে লাফাচ্ছে।

অনেক বেশি মনের জোর বলে এতক্ষণ বর্ণালী নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। আর পারল না। জানলার গরাদটা দু' হাতে ধরতে গিয়েও ব্যর্থ হল। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। বাইরের বারান্দায় ওর পড়ে যাবার শব্দ পেয়ে হারু উঠে এল। মাকে ঐ ভাবে পড়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি করে জল এনে মায়ের চোখে-মুখে দিল। মনে হয় বাথরুম থেকে আসতে গিয়ে মাথা ঘুরে গেছে। বর্ণালী জলের ঝাপটায় চোখ মেলেই মুখের কাছে হারুকে দেখল। ভয়ের স্পর্শটা নতুন করে মুখে পড়ল।

— 'কী হয়েছে তোমার?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ হারুর।

— 'মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল।' কাঁপা কণ্ঠ।

— 'চলো ঘরে। আমি তোমার পাশে শুচ্ছি।'

বাধ্য হয়ে ছেলের সঙ্গে ঘরে এল। একটু বাদেই যদি ঐ শয়তান গাছ থেকে নেমে এই ঘরেও হানা দেয়?

— 'কটা বাজে এখন?' বর্ণালীর প্রশ্ন।

— 'তিনটে বাজছে।' হারু মায়ের পাশে শুয়ে বলে।

বর্ণালী মনে মনে ভাবে, এখনও এক ঘন্টা কাটাতে হবে। ও শুনেছে রাত বারোটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত ভৌতিক আত্মারা জাগ্রত থাকে। ছেলে যখন স্বাভাবিক তখন ঐ প্রেতাত্মা নিশ্চয়ই ঐ গাছেই আছে। হারু মায়ের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বর্ণালীর চোখে ঘুম নেই। জানলার ফাঁক দিয়ে ডালপালা ছড়ানো

কাঁঠাল গাছটা অন্ধকারেও চোখে পড়ছে। মনের মধ্যে জমে থাকা ভয়টাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। এই সময় মনে পড়ল হারু ঐ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তার গলায় ঝোলানো ঠাকুরের লকেটটা দেখছিল কেন? তবে কি নারায়ণের ছবিটাই তাদের রক্ষাকবচ? মনে একটু জোর পায় বর্ণালী।

আচমকা চোখে পড়ে জানলায় দাঁড়ানো কদাকার একটা মূর্তি। যেন কালো সেলুলয়েড দিয়ে তৈরী। প্রথমটা ভয় পেলেও ঠাকুরের লকেটটা মুঠো করে চেপে ধরে। মূর্তিটা ধোঁয়ার আকার ধারণ করে জানলা গলে ঢুকতে গিয়েও থমকাল। একটু বাদেই আবার একটা কালো গোলা পাকিয়ে গড়িয়ে গাছটার অন্ধকারে মিশে গেল। গাছের মগডাল থেকে একটা বুক কাঁপানো হাসির শব্দ সারা আকাশ বাতাস জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। মা তার ছেলেকে জড়িয়ে ধরে এক মনে ভগবানের নাম জপতে শুরু করল।

কালরাত্রির অবসান হল। কালো আকাশে রঙের ছোঁয়া লাগল। দু'-একটা পাখির ডাকও বর্ণালীর কানে এল। গভীর ঘুমের মধ্যে রয়েছে হারু। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল বর্ণালী। আজই ছেলেকে নিয়ে ফকিরবাবার কাছে যাবে। যদি কিছু উপায় বার করতে পারেন বাবাজি।

ভোর ছ'টার সময় পাড়ার বাসিন্দা অধীর এসে হাজির হল। বর্ণালী এই সাত সকালে ওকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

— 'বৌদি, তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল। হারু ঘুম থেকে ওঠেনি তো?' নিচু স্বরে বলল। যার ফলে বর্ণালীর মনে রহস্য দানা বাঁধল। কি এমন কথা বলতে চায় ও?

— 'কী বলবে তুমি?' এগিয়ে এল গেটের কাছে।

— 'গতকাল সন্ধ্যের দিকে হারুর হাবভাব দেখে আমার ছেলে বাবলু ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। সারা রাত ঘুমোতে পারেনি চমকে চমকে উঠছে আর কেঁদে ফেলছে।'

এরপর অধীর সেই গাছ থেকে ঘুড়ি পাড়ার ঘটনা বলে। বর্ণালীর চোখ আরও কপালে ওঠে। আর লুকোতে পারে না। সেও অধীরকে শুরু থেকে সব ঘটনা বলে। শেষে বলে, 'আজকেই ছেলেকে নিয়ে ফকিরবাবার কাছে যাব।' অধীর বাধা দেয়, 'অমন কাজ মোটেও করো না। সারা পাড়ায় ঢিঢিকার পড়ে যাবে। লোকে রং চড়িয়ে আরও কিছু বলবে। তাতে হারুর কাজ পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে।' কথাগুলো ঠিকই বলেছে ও। বর্ণালী চিন্তার স্বরে বলে, 'তাহলে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাব কি করে?'

অধীর বলে, 'আমার একজন চেনাজানা লোক আছে। হরিপালের কাছে তার মাজার। পীরবাবার মাজার[১] বলে বিখ্যাত। অবশ্য পীরবাবা এখন বেঁচে নেই। কিন্তু তার শিষ্য রফিক এইসব কাজ করে। আজ বিশ্বকর্মা পুজোর জন্য আমাদের কারখানা বন্ধ। তুমি হারুকে নিয়ে আমার সঙ্গে চলো। এখানকার কেউ জানতে পারবে না।' বর্ণালী বুকে বল পেল।

— 'হরিপাল? তার মানে সেই তারকেশ্বর লাইনে? এখান থেকে দূর আছে।'

— 'তুমি ভেবো না। আমার শালার গাড়িটা আনিয়ে নিচ্ছি। তুমি শুধু তেলের খরচটা দিও।' কথা পাকা হয়ে গেল। অধীর যাবার আগে বলে গেল ঘন্টাখানেক বাদে সে আসছে। আর হারুকে বানিয়ে কিছু একটা বলতে।

বর্ণালী বাড়ির ভেতরে ঢুকল ছেলেকে ঘুম থেকে তোলার জন্য। ও যদি লক্ষ করত তাহলে দেখতে পেত কাঁঠাল গাছের পাতার জটলার মধ্যে একটা কালো ছায়া জমাট বেঁধে আছে।

এরপর ওরা তিনজন গাড়ি নিয়ে পীরবাবার মাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হল। যাওয়ার পথে কী হল? আর ওখানে কী ঘটেছিল?

হারুকে বর্ণালী আসল কথাটাই বলল। রাতের ঘটনাটাও উল্লেখ করল। মায়ের কথা শুনে সে নিজেও ভয় পেয়ে গেল। মনে পড়ল গাছ বেয়ে গিরগিটির মতো ওঠা। কয়েক ফুট লম্বা হাত বাড়িয়ে ঘুড়ি ধরা। ও ফোন করে মিহিরকে বলল, 'আজ তোরা একটু কাজে সামাল দে। আমি বিশেষ কাজে কলকাতা যাচ্ছি।'

বেলা সাড়ে নটা নাগাদ ওরা গাড়ি নিয়ে বেরোল পীরবাবার মাজারের উদ্দেশ্যে। ঠিক সেই সময়ই কাঁঠাল গাছটা অস্বাভাবিক ভাবে ডালপালা সমেত নড়ে উঠল।

গাড়ি কিছুক্ষণ বাদেই বড় রাস্তা ধরল। ড্রাইভারের পাশে অধীর। আর ওরা দু'জন পিছনের সিটে। খানিকটা গেলে ওরা দিল্লি রোড ধরবে। বর্ণালী একমনে ঠাকুরকে ডেকে চলেছে। যদি কোনোভাবে এই অশুভ আত্মার প্রভাব ছেলের ওপর থেকে কাটানো যায়। হারুও একই কথা ভাবছে। ওর চিন্তা — সব কথা মনে থাকছে না কেন? রাতের ঘটনা শুনে অর্ধেক কথা মনে করতে পারল না। এটা কি ঐ আত্মার জন্যই হচ্ছে?

দিল্লি রোডে পড়ে মারুতিটা গতি তুলল। জানলা দিয়ে বেশ হাওয়া ঢুকছে। অধীরের চিন্তা অন্যরকম। ঝোঁকের মাথায় ওদের নিয়ে এল। যা শুনেছে, তাতে ঐ বিদেহী আত্মা এত সহজে পিছু ছাড়বে না। রাস্তাঘাটে যদি কোনো বিপদ হয়? পিছনের সিটে ঐ যে হারু বসে আছে ও সত্যিই হারু তো? ওর ছদ্মবেশে ঐ দুষ্ট আত্মা নয় তো? ওর মনে একটা ভয়ের আস্তরণ পড়তে শুরু করল। ভয়চকিত চোখে গাড়ির হেড মিররের দিকে তাকাল। যেখান থেকে হারুকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। স্পষ্টভাবে তাকাতেই মুখের চেহারা ওর বদলে গেল। হারুর মাথার কালো চুলের পিছনে একটা অস্পষ্ট কুচকুচে কালো জমাট বাঁধা অন্ধকার! যেন একটা বাদুড় ঝুলে আছে। অধীরের সারা শরীরে একটা ঠান্ডা বাতাস কে যেন বুলিয়ে দিল। আর ঠিক তখন ফটাস করে গাড়ির একটা চাকা ফাটল। ড্রাইভার খুব পাকা ছিল, তাই গাড়িটা উল্টে যেতে যেতে বেঁচে গেল। রাস্তার সাইডে গাড়ি দাঁড়াল। মৃত্যুর খুব কাছ থেকে বেঁচে ফিরে এল ওরা।

সবার মুখেই ভয়ের রেখা। ড্রাইভার বলল, 'নতুন টায়ার। বুঝে পাচ্ছি না কীভাবে ফাটল। আপনারা একটু নেমে দাঁড়ান। চাকা পাল্টাই।'

ফাঁকা রাস্তায় ওরা নেমে দাঁড়াল। রৌদ্রের তেজ এর মধ্যেই চড়া। দু'দিকে ফাঁকা জমি। রাস্তার ধারে দু' একটা বড় কৃষ্ণচূড়া গাছ একটু ছায়া করে রেখেছে। অধীর চেষ্টা করছে ফোনে পীরবাবার শিষ্য রফিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ওর মনে আতঙ্কের মেঘ। হারু অধীরকে কড়ে আঙ্গুল তুলে মাইনাসের চিহ্ন দেখিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছটার কাছে এগিয়ে গেল। সেই সময় অধীর রফিকের লাইনটা পেল। দ্রুত সব কথা বলল। এমন কি হারুর মাথার পিছনে কালো অন্ধকারের ডেলাটার কথাও। রফিকের গম্ভীর স্বর ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল, 'মন দিয়ে শোনো। ছেলেটাকে চোখের আড়ালে কোরো না। তোমার কথায় বুঝতে পারছি ঐ প্রেত এখনও ওর সঙ্গেই রয়েছে। ও চাইবে না এই মাজারে আসতে। এরপরেও দুর্ঘটনা ঘটাবে। গাড়ির সব কাঁচ তুলে দিয়ে ধূপের কাঠি কয়েকটা জ্বালিয়ে রাখো। হয়ত কিছুটা সুরাহা মিলবে। কালীতলার মুখে এসে ফোন করবে। আমার কয়েকজন শিষ্য তোমাদের নিয়ে আসবে। কেননা ঐ পথে গাড়ি ঢুকবে না।' লাইন কেটে গেল।

রফিকের কথায় অধীর আরও ভীত হয়ে পড়ল। গাছের তলায় চোখ পড়ল। হারু সেখানে নেই। বর্ণালীকে জিজ্ঞেস করল হারুর কথা। বর্ণালীও অন্যমনস্ক ছিল। খেয়াল করে নি। অধীর গাছের কাছে গিয়ে এদিক ওদিক দেখল। ঝামেলায় পড়া গেল! বর্ণালীও উদ্বিগ্ন। এই সময় হারু গাছের ওপর থেকে হি হি করে হেসে উঠল। দু'জনের বুকটাই ছ্যাঁৎ করে উঠল। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখে একটা ডালে পা দুটো ঝুলিয়ে বাবু বসে আছে। ঐ দৃশ্য দেখে যে কোনো মানুষ ভয় পেয়ে যাবে।

অধীর কাঁপা গলায় বলল, 'হনুমানের মত গাছে উঠে বসে আছিস কেন? নেমে আয়। যেতে হবে।'

ও কোনো উত্তর না দিয়ে দাঁত বার করে হাসতে লাগল। বর্ণালী বুদ্ধি করে হাতের ব্যাগ থেকে একটা কেক বার করে বলল, 'এই নে তোর জন্য কেক এনেছি।' কেকটা দেখে হারুর চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। অত উঁচু ডাল থেকে এক নিমেষে সড়াৎ করে নিচে নেমে আসে।

গাড়ির টায়ার ইতিমধ্যে পাল্টানো হয়ে গেছে। অধীর আর বর্ণালী ভয়টাকে গিলে ফেলল। অধীরের ইশারা অনুযায়ী বর্ণালী ছেলেকে নিয়ে গাড়ির ভেতর গিয়ে বসল। অধীর ডৰাইভারকে জানলার কাঁচ বন্ধ করে এসি

চালাতে বলল। অধীরের কথামত ড্রাইভার সুকান্ত ড্যাশবোর্ডের ভেতর থেকে কয়েকটা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিল এবং গাড়ি চালু করল।

বর্ণালী আড়চোখে ছেলেকে দেখল। রাক্ষসের মতো কেক চিবোচ্ছে। নিজের ছেলে হলেও কি রকম একটা লাগছে! কেননা ও জানে ছেলের শরীরের ভেতর লুকিয়ে বসে আছে একটা পিশাচ! এই ভাবনাটাই ওর মনে তুলছে একটা বিরাট আতঙ্কের ঝড়। মনে মনে ডেকে চলেছে ঈশ্বরকে। এইটুকু পথ যেন নির্বিঘ্নে পার হতে পারে! আবার যেন কোনো অজানা বিপদ হাঁ করে তেড়ে না আসে।

অধীর উপকার করতে এসে ফেঁসে গেছে। ভাবতেই পারেনি এই রকম বিপদে পড়তে হতে পারে। ও ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। আর কতক্ষণ দেরি? এখন যেন এক মিনিট সময় এক ঘন্টার মত লাগছে। শুকনো মুখে সামনের দিকে চেয়ে আছে।

হারু মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ধূপের ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে।’ ওরা কোনো উত্তর দিল না। রাগে দাঁত কড়মড় করে উঠল হারু, ‘অধীরদা, ধূপগুলো নেভাও!’ যেন কেউ নির্দেশ দিচ্ছে।

বর্ণালী সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, ‘তুই আর একটা কেক খাবি?’ যেন বাচ্চা ছেলেকে ভোলাচ্ছে। হারু কথা না বলে হাত বাড়াল। কেকটা হাতে দিতে গিয়ে চমকে উঠল বর্ণালী। ছেলের হাতটা কালো বড় বড় লোমে ভরা! যেন গরিলার হাত। কোনো রকমে কেকটা হাতে দিয়ে একটু সরে বসল। ক্রমশ তার স্নায়ুর ওপর চাপ বাড়ছে। কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে কে জানে! ধূপের গন্ধ ছাপিয়ে একটা জান্তব বোঁটকা গন্ধে গাড়ির ভেতরটা ভরে উঠল।

অধীরের সাথে ড্রাইভার সুকান্ত দু'বার নাক টানল। ‘ইস, কী পচা একটা গন্ধ বেরোচ্ছে!’ অধীরের মুখ থেকে বেরিয়ে এল। সুকান্তও ড্রাইভ করতে করতে কথাটায় সায় দিল। অধীর আরও দুটো ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিল। বর্ণালী লক্ষ্য করল দেশলাই জ্বালাবার আগুন দেখেই হারু কি রকম সিঁটিয়ে গেল। উঃ, পথটাও যেন শেষ হচ্ছে না! আর থাকতে না পেরে বর্ণালী জিজ্ঞেস করল, ‘আর কতদূর?’ সুকান্ত উত্তর দিল, ‘হরিপাল ঢুকছি।’ হাইওয়ে ওরা খানিকটা আগেই ছেড়ে এসেছে।

অধীর এক বছর আগে এই কালীপুর মাজারে এসেছিল দিদির মেয়েকে নিয়ে। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছিল। অনেক ডাক্তার — ওষুধ করেছিল। সেই সময় ওর অফিসের এক বন্ধু এখানকার ঠিকানাটা দিয়েছিল। রফিক দেখেই বলেছিল বেটিকে কেউ শুখা বাণ মেরেছে। একটা তাবিজ দিয়েছিল। অধীর আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল তাবিজের ক্ষমতা দেখে। কয়েক মাসের মধ্যে ভাল হয়ে গিয়েছিল তার বোনঝি। সেই থেকে রফিকের ওপর ওর বিশ্বাস।

সুকান্তকে ডান দিকের রাস্তাটা ধরতে বলল। এই রাস্তা গিয়েছে কালিপুর অটো স্ট্যান্ডের ওপর দিয়ে। ঐ স্ট্যান্ডে ওদের গাড়ি থেকে নামতে হবে। তারপর পায়ে হাঁটা পথ।

‘আমরা কোথায় যাচ্ছি?’ হারুর মুখ দিয়ে কে যেন চোঙা করে কথাটা বলল। সুকান্ত পর্যন্ত ঘাড় ঘুরিয়ে হারুকে দেখল। এটা কি কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর? ড্রাইভার যাতে কিছু বুঝতে না পারে তাই বর্ণালী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ‘কেন, তোকে বলেছি তো! একজন ভালো কবিরাজকে দেখাব যাতে তোর অসুখ ভালো হয়ে যায়।’ কথাটা শুনে হারু ওরকম যান্ত্রিক গলাতেই বলে উঠল, ‘আমি সব জানি। এখনও ভালো কথায় বলছি ফিরে চলো।’ অধীর মোবাইলে রফিককে মেলাল।

দু'মিনিটের মধ্যে কালিপুর অটো স্ট্যান্ডে ওদের মারুতি পৌঁছল। ওখানেই গাড়িতে ওয়েট করার জন্য সুকান্তকে বলল অধীর। কিন্তু গাড়ি থেকে হারু নামতে চাইছে না। অধীর টেনে নামাতে পারছে না। মনে হচ্ছে সিটের গদির সঙ্গে কেউ ওকে ফেভিকল দিয়ে সেঁটে রেখেছে। এই সময় দু'জন লোক এল। অধীর বুঝল এরা ঐ দরগা থেকেই আসছে। ওরাও টানাহ্যাঁচড়া করে হারুকে কোনোরকমে নামাল। একরকম পাঁজাকোলা করে নিয়ে চলল। অনেকেই অবাক চোখে তাকাচ্ছে।

ওরা এবার আলু আর সবজি ক্ষেতের ভেতর দিয়ে সরু আলপথটা ধরল। রাগে গরগর করছে হারু। রোগা পাতলা ছেলেটার গায়ে এত শক্তি কোথা থেকে এল? বর্ণালী ছেলের ঐরকম মূর্তি দেখে কেঁদে ফেলল। অধীর সান্ত্বনা দিল, 'আমার মন বলছে সব ঠিক হয়ে যাবে।' দু'জন শিষ্য বলে উঠল, 'বাবার কাছে এসেছেন। কোনো চিন্তা করবেন না। কত ভূতে ধরা, প্রেত, পিশাচ, জিন বাবার সর্ষেপোড়ায় পালাবার পথ পায় না।' হারু রক্ত চোখে চ্যালা দুটোকে একবার দেখল।

মাজারের গেটের কাছে এসে ও এক ঝটকায় ডান হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। চোখের পলকে ডান হাত দিয়ে পাশের লোকটার গলার টুঁটিটা চেপে ধরে। এত জোরে ধরেছে যে ওর গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোচ্ছে না। অধীর আর বর্ণালী পিছনে আসছিল। ওরা ঐ দৃশ্য দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। সেই শব্দে মাজারের ভেতর থেকে অনেকেই বেরিয়ে এল। তার সঙ্গে বেরিয়ে এল রফিক। গায়ে কালো রঙের বিরাট পকেট দেওয়া আলখাল্লা। গলায় পুঁতির অনেকগুলো মালা। শক্তসমর্থ চেহারা। কালো লম্বা দাড়ি। কপালে কালো তিলক।

'গলা থেকে হাত নামা এখনই।' বজ্রকঠিন গলায় বলল রফিক।

ঐ কঠিন গলার শব্দে হারু ওর দিকে তাকাল। রফিকের চোখ দুটো যেন হারুর চোখ ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে গেল। মনে হচ্ছে হারুর ভেতরটা পর্যন্ত রফিক দেখতে পাচ্ছে। হারুর হাতটা একটু শিথিল হল। সবাইকে চমকে দিয়ে আবার একবার বাজখাঁই কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে রফিক, 'শেষ বার বলছি। হাত নামা! আর ভেতরে এসে এই গোল কাটা জায়গাটার ভেতর চুপ করে দাঁড়া।' হারু এক মিনিট কী চিন্তা করল। সবাই নিশ্চুপ। তারপর বাধ্য ছেলের মত গুটিগুটি পায়ে মাটিতে কাটা একটা গোল দাগের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। চোখে-মুখে রাগের চিহ্ন।

বেশ কয়েকজন এসেছিল রফিকের কাছে নানারকম সমস্যা নিয়ে। রফিক বলল, 'এঁরা দূর থেকে এসেছেন। আজ তোমরা বাড়ি যাও। কাল এসো।'

কয়েক মিনিটেই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল। বর্ণালী দেখল একটা বড় নিমগাছের নিচে পীরবাবার ছোট মাজার। চারিদিকে শুধু সবজি ক্ষেত। লোকবসতি নেই বললেই চলে। আলোর কোনো ব্যবস্থা নেই। শুধু দু' সার টিনের ছাউনি দেওয়া ঘর। শান্ত নিরিবিলি। দু'জন শিষ্য ওদেরকে মাটির দাওয়ায় বসতে বলল। অধীর ভাবছে বেলা হয়েছে। কতক্ষণ লাগবে কে জানে! খিদে তেষ্টাও তো আছে।

রফিক ওদের কাছে এসে নিচু স্বরে বলল, 'একেবারে ছেলেটাকে গ্রাস করে ফেলেছে। কতক্ষণ সময় লাগবে বলতে পারব না। তুমি তো মা, মনটাকে একটু শক্ত রেখো। মনে রাখবে আমি যেসব কান্ডকারখানা করব সব কিছুই তোমার ছেলের মঙ্গলের জন্য। জানবে এই মুহূর্তে ওটা তোমার ছেলে নয়। ছেলের রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক ভয়ঙ্কর আত্মা। একটু বাদেই ঐ আত্মা অনেক কিছু করবে। কখনও কাঁদবে, কখনও হিংস্র হবে। শুধু নিজের মনকে শক্ত রেখে আল্লার নাম স্মরণ করবে।' এই সময় একজন লোক ওদের জন্য জল আর কিছু বোঁদে নিয়ে এল।

রফিক কালো লম্বা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে চিন্তান্বিত মুখে একটা ছোট ঘরে ঢুকে গেল। বর্ণালী আর অধীর ভেবে পাচ্ছে না এরপর কী ঘটবে। ওরা কখনও নিজের চোখে ভূত ছাড়ানো দেখেনি। শুধু লোকের মুখে শুনেছে। একটু পরেই তারা ঐ অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে চলেছে।

ওরা হারুর দিকে তাকাল। তখনও রাগে ফুঁসছে। মাঝে মাঝে একটা পা গোলাকার দাগের বাইরে দিতে গিয়েও পিছিয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য ব্যাপার! ওদের মনে খানিকটা ভরসা এল। কিছু সুরাহা এই পীরবাবার শিষ্য রফিকই করতে পারবে। এক শিষ্য কানে কানে ওদের বলল, 'বাবা ওকে মন্ত্র পড়ে বেঁধে দিয়েছে। ওখান থেকে ও এক পাও নড়তে পারবে না।'

রফিক ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ডান হাতে একটা চামর। মুখটা থমথমে। একেবারে হারুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'কোথা থেকে একে ধরেছিস?'

প্রশ্ন শুনেই হারু মাটিতে এক দলা থুতু ফেলল। বর্ণালী দেখল থুতুর মধ্যে ছোট ছোট পোকা কিলবিল করছে! কোনো মানুষের থুতুতে এইরকম পোকা থাকতে পারে? রফিকের মুখটা ক্রমশ আরও কঠিন আকার ধারণ করছে। হাতের চামরটা ওর সামনে দুলিয়ে বলল, 'কী হল? কোনো জবাব নেই কেন? শেষবার জিজ্ঞেস করছি এই ছেলেটার ঘাড়ে চাপলি কেন?'

কোনো উত্তর নেই।

হাতের চামরটা মাথায় একবার ঠেকাতেই হারু মুখ দিয়ে একটা যন্ত্রণার শব্দ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। বর্ণালীর মনটা কেঁদে উঠল। তারপরেই মনে পড়ল রফিকের কথাগুলো। ঢোঁক গিলে ফেলল। হারু কান্নার স্বরে বলল, 'খুব খিদে লেগেছে, কিছু খেতে দাও না গো!' বর্ণালীর মায়ের মন কেঁদে উঠল। ভুলে গেল রফিকের সব সাবধানবাণী। ব্যাগের মধ্যে মিষ্টি এনেছিল সেই নিয়ে হারুর কাছে পৌঁছে গেল। রফিক নিজেও এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। একেবারে গোলাকার বৃত্তের মধ্যে চলে গেছে বর্ণালী।

হারুর মুখে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। বর্ণালী দেখল ছেলের জায়গায় একজন বুড়োটে মতো লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত দুটো কালো বড় বড় লোমে ঢাকা। সারা মুখে হিংসার ছায়া। চোখের তারা বনবন করে ঘুরছে। বর্ণালীর মুখে ভয় খেলা করতে লাগল। ঐ বুড়োটার কালো লোমশ হাত দুটো তার গলা লক্ষ করে এগিয়ে আসছে। ওর মস্তিস্ক জানান দিচ্ছে সে ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে যেখান থেকে ফেরা খুবই কষ্টকর।

হারুবেশী শয়তানটার হাত দুটো বর্ণালীর কণ্ঠ নালি চেপে ধরার এক সেকেন্ড আগেই রফিক ক্ষিপ্র হাতে ওকে সরিয়ে নিল। এক চুলের জন্যে রক্ষা পেল বর্ণালী। লক্ষভ্রষ্ট হতেই শয়তানটা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করল। মনে হচ্ছে কোনো ক্ষুধার্ত বাঘকে খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়েছে। রফিক কঠিন মুখে বর্ণালীর দিকে তাকাল, 'আমি আগেই বলেছি এই মুহূর্তে ও তোমার বেটা নয়। আগে থেকে বেশি করে খেয়ে খেয়ে জিনটা নিজের শক্তি বাড়িয়েছে। তোমরা নিজের জায়গা থেকে একদম হেলবে না যাই ঘটুক না কেন।' বর্ণালী নিজের ভুল হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে।

এবার রফিক ইঙ্গিত করল এক শিষ্যের দিকে। সে দৌড়ে গিয়ে ঘর থেকে একটা পিতলের সর্ষের তেলের বাটি আর এক কৌটো কালো সর্ষে নিয়ে এল। অধীর দেখছে সূর্য মাথার ওপর এসে গেছে। সাড়ে বারটা বাজছে। রফিক চামরটা রেখে তেলের বাটি থেকে কিছুটা তেল আর কিছু সর্ষে হাতের তালুতে নিল। বিড়বিড় করে কিছু দুর্বোধ্য মন্ত্র আউড়ে সেটা ছুঁড়ে দিল হারুর গায়ে। মনে হল এক রাশ বিছুটি পাতা কেউ ওর সমস্ত দেহে মাখিয়ে দিল। 'জ্বলে গেল, জ্বলে গেল', করে সারা গা হাত—পা চুলকোতে লাগল।

— 'এখনও বল কে তুই? কী নাম? নাহলে এরপর...' কথা শেষ করল না রফিক।

গা চুলকোতে চুলকোতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে হেসে উঠল ঐ মনুষ্যরূপী দানব। তারপর রফিকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই কয়েকটা মন্ত্র শিখে আমাকে তাড়াতে পারবি না। তোর গুরু থাকলে হয়ত পারত!'

গরমে রফিকের সারা মুখ ঘামে জবজব করছে। সেই অবস্থায় ও কর্কশ গলায় বলে উঠল, 'দেখি পারি কি না?' বলে পাশের থেকে লোহার একটা লম্বা চিমটে তুলে নিল। আলখাল্লার পকেট থেকে একটা সাদা কড়ি বার করে চিমটের সরু মুখে আটকাল। ওর সমস্ত ভাবভঙ্গি একদৃষ্টে তাকিয়ে লক্ষ্য করছে ঐ অপদেবতা। চিমটে দিয়ে কড়িটা ওর কপালে ধরতেই শয়তানটার গগনভেদী আর্তনাদ গরম বাতাসকে ভারী করে তুলল। অধীর আর বর্ণালী দুরুদুরু বুকে যেন হাড় হিম করা ভূতের সিনেমা দেখে চলেছে। এসব যে সত্যি হয় বা আছে না দেখলে বিশ্বাস হত না।

হারুর কপালে যেখানে কড়িটা ধরেছিল সেখানে একটা লাল দগদগে ঘায়ের চিহ্ন। হারুর জায়গায় আবার সেই কদাকার বুড়োটা ফিরে এসেছে। গাল দুটো তোবড়ানো। সারা গালে খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি। নাকের জায়গায় একটা কালো গর্ত। চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। রাস্তাঘাটে এইরকম চেহারার কাউকে দেখলে সকাল বেলাই লোকে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

রফিক চিমটে আবার বাড়িয়ে ধরতেই ও গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'আমার নাম রুদ্র তান্ত্রিক। শ্মশানের বটগাছটা আমার থাকার জায়গা।'

রফিক বুঝল এত সহজে একে ঘাড় থেকে নামানো যাবে না। কেননা এই বিদেহী আত্মা নিজেও মন্ত্রতন্ত্র জানে। কাটান দিতে পারবে। নিমগাছের ছায়া সরে গিয়ে রোদ্দুরে ভরে গেছে মাজারের প্রাঙ্গন। এই প্রখর সূর্য মাথায় নিয়ে এখানে আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না। তাই রফিক শেষ করতে চাইল প্রশ্নোত্তর পর্ব। কাগজের মোড়ক থেকে কিছু গুঁড়ো মন্ত্রপূত গুঁড়ো পাউডারের মত জিনিস ভূতে ধরা হারুর মুখে ছুঁড়ে দিল। ইশারায় ওর সহচরদের ডাকল। পাউডারের গুঁড়ো ধোঁয়ার আকারে আধা মানুষ আধা ভূত জীবটিকে ক্রমশ নির্জীব করে দিল।

রফিক হুকুম করল, 'একে নিয়ে গিয়ে তন্ত্রের ঘরে বসা।' ওরা তিনজনে অজ্ঞান হারুকে চ্যাংদোলা করে ঘরে নিয়ে গেল। ঐ রোদ্দুর থেকে উঠে রফিক ছায়ায় ওদের কাছে এল। ঘামে কালো আলখাল্লাটা ভিজে গেছে। রোদের তাপে মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। অধীরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যত সহজ হবে ভেবেছিলাম ততটা না।' ওর কপালে চিন্তার রেখা।

বর্ণালী সে কথা শুনে আতঙ্কিত হল। ঐ মুখ দেখে রফিক বলে উঠল, 'ভয় পেও না। আমিও পীরবাবার শিষ্য। এত সহজে হার মানব না। একটু দেরি হবে এই যা। বরং তোমরা এই ফাঁকে কালীপুর গিয়ে কোনো হোটেলে খেয়ে এসো।' আর না দাঁড়িয়ে রফিক ঘরে ঢুকে গেল। ওদের দু'জনেরই খাবার ইচ্ছে নেই। কিন্তু ড্রাইভার সুকান্ত ওখানে আছে। তাই ওরা আল ধরে কালীপুরের দিকে এগোল। চারিদিক রোদের তেজে উত্তপ্ত। গাছপালাগুলো নিথর। একটুও বাতাস নেই। কেমন যেন চুপচাপ সব। যেন সবাই মিলে দূরাগত কোনো বিপদের ভয়ে অপেক্ষারত! বর্ণালী বলল, 'আমাদের জন্য তোমাকেও কষ্ট করতে হচ্ছে।'

অধীর উত্তর দিল, 'হারু ভালো হয়ে গেলেই আমার কষ্ট সার্থক।'

সুকান্তকে খাবার টাকা দিয়ে ওরা ফিরে এল দরগায়। যে ঘরে হারুকে রেখেছিল সেখান থেকে ভেসে আসছে নানাবিধ নারকীয় চিৎকার। ওদের দু'জনের বুকের ভেতরে হাতুড়ি পিটতে শুরু করল। খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই ওদের মুখগুলো ভয়াল আকার ধারণ করল। রফিকের সামনে লোহার বাক্সের মধ্যে ছোট ছোট কাঠ জ্বলছে। তার উল্টো দিকে একটা আসনে বসে আছে এক তাল রক্তাক্ত মাংসের একটা শরীরের মূর্তি। রফিকের চোখ মুখে ধনুক ভাঙা পণ। তার আসনের একধারে ছোট একটা করোটি আর পীরবাবার একটা বড় ছবি। ঐ মাংসের পিন্ড থেকে ভেসে আসছে এক অদ্ভুত শব্দ। অনেকটা বিলাপ ধ্বনির মত। কিন্তু হারু কই?

রফিকের কঠিন গলা, 'আর তোমার তন্ত্রমন্ত্র কিছু খাটবে না। ভুলে যেও না তুমি এখন মৃত।'

অস্পষ্ট কণ্ঠে কতশত যোজন দূর থেকে কেউ বলে উঠল, 'জানি আমি মৃত। আমার অপূর্ণ সাধনার পূর্ণতার জন্যই এই নবীন দেহটা আমি ধারণ করেছি। এর হালকা রাশ সে কাজে সহায়তা করেছে।' কথাটা বর্ণালীও শুনতে পেল। কথাগুলো শুনে মনে হল হৃৎপিন্ডটা এক লাফে গলার কাছে চলে এসেছে। অধীর বুঝল বৌদি আবার কিছু করে বসতে পারে এবং রফিক এই সময় অমনোযোগ হয়ে পড়লে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

রফিক একটু নরম স্বরে আত্মাটাকে বলল, 'এ তোমার মিথ্যে ধারণা। কারোর ক্ষতি করে কোনো সাধনায় ফল লাভ করা যায় না। এ আমার গুরুর কথা। ছায়া কোনোদিন কায়ার রূপ ধরে বেশিদিন থাকতে পারে না। এই হল জগতের নিয়ম। তুমি ভুল ধারণা ছেড়ে এই শরীরটাকে মুক্তি দাও। দেখ ওর মা কাতর চোখে তোমার কাছে এই প্রার্থনা করছে। মায়ের কান্না তোমাকে অভীষ্ট লাভ করতে দেবে না।' এক টানে কথাগুলো বলল।

অতৃপ্ত আত্মা নীরব। সারা ঘর জুড়ে নিস্তব্ধতার আবেশ। পিন পড়া নীরবতা। মনে হচ্ছে ঐ বিদেহী তান্ত্রিক কিছু চিন্তা করছে। পরবর্তী উত্তরের জন্যে সবাই উদগ্রীব। এই সময় একটা চোরা শব্দ সবাইয়ের কানে এসে লাগল। রফিক ছাড়া বাকিরা এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। রফিক হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ঐসব ঝামেলা করে

তুমি পার পাবে না। মন্ত্রের দ্বারা এখানের সবাইকে আমি সুরক্ষিত করে রেখেছি। নিজে তান্ত্রিক হয়ে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।' এবার অধীরের চোখ পড়ল চোরা শব্দের উৎসস্থলে। দেওয়ালে টাঙানো মরচে-ধরা তরোয়ালটা পেরেক থেকে আপনা-আপনি খুলে মাটির দিকে নেমে আসছে কাউকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে। মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ ওর বেরিয়ে এল।

রফিকের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওটা পুনরায় দেওয়ালে আটকে গেল। রফিক যে আরও বেশি শক্তি ধরে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

আবার কঠিন গলার স্বর শোনা গেল রফিকের, 'অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। তুমি যদি ভেবে থাকো যে কোনো ভাবে সময় কাটিয়ে রাত্রি ডেকে আনবে তাহলে ভুল করছ।' করোটিতে মাখানো সিঁদুরের ডেলা থেকে একটু সিঁদুর আঙুলে করে নিয়ে চোখ দুটো বুজে দুর্বোধ্য মন্ত্র পড়ে চলল ও। প্রায় মিনিট তিনেক ঐরকম উচ্চস্বরে মন্ত্র পড়ার পর সিঁদুরটা মৃত রুদ্র তান্ত্রিকের আসনে ছোঁয়ানো মাত্রই ঐ রক্তাক্ত মাংসপিন্ডের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। ওটা ধীরে ধীরে আবার হারুর আকৃতি ধারণ করতে শুরু করল। রফিকের মুখে একটা জয়ের হাসি এতক্ষণ বাদে দেখা দিল।

মিনিটখানেকের মধ্যেই আসনে হারুর উপস্থিতি দেখা গেল। বর্ণালী ভেবেছিল ছেলেকে বোধহয় আর এ জীবনে দেখতে পাবে না। হারুর দিকে তাকিয়ে রফিক প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'এই অস্থায়ী আধার ছেড়ে তোমার স্থায়ী আধারে যেতে কিসের অবলম্বন চাও?' ঘর্মাক্ত হারু মাথা দোলাল। কিন্তু উত্তর দিল না। সবাইকে অবাক করে দিয়ে রফিক হঠাৎ উঠল। জ্বলন্ত ধূপের গোছা হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে ওটা হারুর গায়ের কাছে নিয়ে যেতেই হারু ভয়ে ককিয়ে উঠল। রফিকের চোখ দুটো রাগে ফেটে পড়ছে।

'বলছি বলছি। ওদের বাড়ির কাঁঠাল গাছটাকে অবলম্বন করে আমার স্থায়ী ঠিকানায় চলে যাব।' আবার রফিক নিজের আসনে বসল। ছোট্ট ঘরটা গরমে কাঠের আগুনের ধোঁয়ায় যেন বৈদ্যুতিক চুল্লিতে পরিণত হয়েছে।

রফিক অধীরের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি ওদের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে বলো কাঁঠাল গাছটা কী অবস্থায় আছে। এর ছলচাতুরিতে বিশ্বাস করা যায় না।'

অধীর অনেক চেষ্টায় বাড়ির লাইন পেয়ে ভাইকে পাঠাল হারুদের বাড়ি। হারু ধীরে ধীরে ন্যাতার মতো আসনে এলিয়ে পড়ল। আর এই সময় বাইরে বড় নিমগাছটার ডালপালাগুলো এক দমকা হাওয়ায় দুলে উঠল। একটু বাদেই অধীরের ফোনে খবর এল হারুদের বাড়ির কাঁঠাল গাছের একটা মোটা ডাল একটু আগেই ভেঙে পড়ে গেছে।

রফিক সন্তুষ্ট হয়ে একটা কাঁচের বোতল থেকে খানিকটা জল হারুর সারা গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বলল, 'ওকে শুদ্ধ করে দিলাম। আর কোনো ভয়ের কারণ নেই। তবু আমি একটা তাবিজ দিচ্ছি। ওটা ওর গলায় পরিয়ে রাখবে। কেননা কয়েকটা দিন ঐ আত্মা ওর ধারে কাছে ঘুরঘুর করবে একটু সুযোগের আশায়। আগামী তিনদিন একা একা ওকে কোথাও যেতে দেবে না। সন্ধ্যের পরে তো নয়ই।'

বর্ণালী হাত জোড় করে রফিককে বলল, 'আমি কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাব! আমার একমাত্র ছেলেকে আপনি নতুন জীবন দান করলেন।'

— 'আমি নই। সব আল্লার কৃপা আর গুরু পীরবাবার দোয়া।' হারুকে হাত ধরে রফিক দাঁড় করাল। যেন গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠল ও।

ফিরে আসার সময় জোর করে পাঁচ হাজার এক টাকা ওদের হাতে তুলে দিল বর্ণালী। সূর্য এখন পশ্চিম দিকে ঢলছে। একটু এগোতেই দু'-একটা ঘুড়ি আকাশে উড়ছে দেখতে পেয়ে হারু বলে উঠল, 'ইস আজকে বিশ্বকর্মার দিন, ঘুড়ি ওড়ানো হল না!' ফাঁকা আলের পথ ধরে ওরা তিনজন কালীপুরের দিকে এগোল। যেখানে সুকান্ত গাড়ি নিয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

---

১. যাঁরা পীরবাবা রফিকের ব্যাপারে জানেন না তাদের কাছে অনুরোধ 'পীরবাবার শক্তি' 'ভুতে ধরা ' 'শিহরনের ছোঁয়া ' 'ও একা' গল্পগুলো পড়লে জানতে পারবেন।

